যোগ-সোপান

(জীবন যজ্ঞের সাধন পদ্ধতি)

নাথমার্গের সাধক
শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৭

মুদ্রণে—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ।
ইস্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২/৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২।

[প্রথম সংস্করণ]

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। চুণাগলি কালী মন্দির
২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন,
কলিকাতা—১২
২। ইস্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২/৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
৩।

ওঁ তৎ সৎ

উৎসর্গ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী
জননীর
স্বর্গত আত্মার
তৃপ্তি কামনায়
'যোগ-সোপান'
তর্পণ স্বরূপ
অর্পিত হইল।

চিরকৃতজ্ঞ সন্তান
গোষ্ঠবিহারী

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

ত্যাগ ও ভোগের
　　　　মিলন জালে—
বাল্য কৈশোর
　　　　যৌবন কালে,
নির্জন গৃহ
　　　　পবিত্র জীবন
সাত্ত্বিক আহার
　　　　স্বল্প ভাষণ,
ঐকান্তিকী ইচ্ছা
　　　　সরল বেশ—
যোগ সাধনার
　　　　সুপরিবেশ।
দেব দ্বিজ সেবা
　　　　গুরুজনে ভক্তি,
জ্ঞানের সাধনে
　　　　অসামান্য শক্তি।
করুণা বা মুক্তি
　　　　সাধক যাচে না,
না চাহিতে পাওয়া—
　　　　চাহিলে মেলে না।
সাধনে অর্জিয়া
　　　　পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান
অমৃতের পুত্র
　　　　লভিবে নির্বাণ।

নিবেদন

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥

ভারতীয় পরাবিদ্যায় দর্শনসমূহের মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ছয়টির মধ্যে একটি যোগদর্শন। আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষে 'যোগ' এক বিশেষ সাধনা। যোগী পতঞ্জলি এই দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা। পাতঞ্জল দর্শনের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে,—

অথ যোগানুশাসনম্।" (সমাধি পাদ—১)

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পতঞ্জলি যোগের প্রবক্তা নন; তিনি যোগের পুনরুপদেশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং যোগ যে বহু প্রাচীন কালের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, বিরাট পুরুষ বিষ্ণু এবং দেবাদিদেব মহেশ্বর বিভিন্ন যোগের প্রবক্তা বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যোগধর্মের প্রাচীনত্ব আরও অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য, মহাযোগী মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, ব্যাসদেব, গর্গ প্রভৃতি যোগমার্গের ঋষিদিগের নামও যোগের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে প্রাক্‌ঋগ্বেদীয় যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে যোগসাধনা প্রচলিত থাকার প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। ঐ নিদর্শন সকলের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট, নাসাগ্রে নিবদ্ধ-দৃষ্টি, সমকায়শিরগ্রীব বহু প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্যার জন্ মার্শাল, স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ঐ মূর্তিগুলিকে যোগীমূর্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মার্শাল অবশ্য এইরূপ একটি মূর্তিকে পশুপতি শিবের মূর্তি বলিয়া সনাক্ত করিতে

চাহিয়াছেন। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই যে, যোগধর্ম ও শৈবধর্মের উদ্ভবকাল প্রাক্‌বৈদিকযুগ।

ব্রাত্য সম্প্রদায় ও অথর্বণ নামক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুহ্য সাধনার কথা আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে জানিতে পারি, তাহাও মূ .তঃ যোগসাধনা। এই দুইটি সম্প্রদায় ছিল তাহাদের গুপ্ত সাধন বলে অলৌকিক দৈবীশক্তিসম্পন্ন জাতি।

পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী আর্যঋষিরা ছিলেন প্রধানতঃ প্রকৃতি পূজক। ইন্দ্র, (সূর্য্য) চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি তাঁহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে দেবতাগণকে প্রসন্ন করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কামনা পূরণ করাই ছিল আর্যঋষিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। প্রাক্‌বৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসে পুরুষ ও প্রকৃতি (নারী) উভয়েরই ছিল তুল্য অধিকার। প্রাক্‌বৈদিক সম্প্রদায়গুলি ছিল পরলোক ও মোক্ষলাভে বিশ্বাসী। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে ঋগ্বেদীয় যুগে আর্যঋষিগণ যতি যোগী সম্প্রদায়গুলির সহিত ধর্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া যোগের বিরোধিতা করিলেও পরিশেষে যোগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে, বৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হইতে থাকে। ইহারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী কালে যোগ এক নির্বিরোধ বৈদিক সাধনা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। শ্বেতাশ্বেতর, কঠ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে যোগের সাধনা পরিস্ফুট। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, আত্মা প্রভৃতির উপাসনা যোগসাধনারই নামান্তর মাত্র। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বিশেষ করিয়া ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাংশে যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের উপায় বর্ণনায় "আসীনঃ" "ধ্যানাচ্চ" ৪।১।৭-৮ প্রভৃতি সূত্রে যোগেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রয়ীধর্মী বৈদিক উপাসনায় প্রাক্‌-বৈদিক যোগী সম্প্রদায়ের মোক্ষ বা পরামুক্তি যুক্ত হইয়া ধর্ম, অর্থ,

কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল সমন্বিত হইয়া হিন্দুধর্ম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

সাংখ্য দর্শনেরও উৎস প্রাক্‌বৈদিক যুগ। মহাভারতে বলা হইয়াছে,–"সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে।" সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন সনাতন তথা চিরন্তন। অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন বহু প্রাচীন কালের। সাংখ্য দর্শনের সহিত যোগদর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। বস্তুতঃপক্ষে সাংখ্য একটি ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদ বিশেষ, এবং যোগ তাহা কার্যে রূপায়িত করার সাধন পদ্ধতি মাত্র। 'গার্বে' (Garbey) অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"Yoga is Shamkhya translated into action," সাংখ্য ও যোগের মধ্যে মিল যেমন পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব বিচারে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। কারণ ঈশ্বর প্রামাণ্য নন। তাই সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর অসিদ্ধ। "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ।" অপর পক্ষে যোগদর্শন স্বেশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।" ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বর-পুরুষ এই সকলের উর্ধ্বে। কিন্তু, জীবে অবিদ্যাদি ক্লেশ পঞ্চক বর্তমান। সংযম প্রয়োগের দ্বারা চিত্তের বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে পারিলে অবিদ্যাদি ক্লেশের বিনাশ হয়। প্রকট বৈরাগ্য অর্জন করিয়া চিত্তকে যাবতীয় সংস্কারের সহিত দগ্ধ করিতে পারিলে আত্মা চিৎ মাত্রে—স্বরূপ মাত্রে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন প্রকৃতি দেবী আর আত্মা সন্নিধানে তাঁহার মায়াজাল বিস্তার করিতে পারেন না; তখন কেবল এক আত্মাই থাকেন। আত্মার এই কেবল হওয়াকেই 'কৈবল্য মুক্তি' বলে। বস্তুতঃ পক্ষে ইহাই যোগীর ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া বা যোগীর ঈশ্বর হইয়া যাওয়া।

সাংখ্যের প্রকৃতিই প্রধান, পুরুষ গৌণ। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হইলেও অন্ধা, আর পুরুষ জ্ঞানময় হইলেও উদাসীন—অকর্তা। প্রকৃতির কার্য ছায়ারূপে পুরুষে অনুক্রান্ত হওয়ায় পুরুষ অকর্তা হইয়াও কর্মফল ভোক্তা। অবিবেক বশতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই দুঃখের কারণ, ইহাই বন্ধন ; বিবেক দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় ; সাংখ্য দর্শনে ইহাই জীবের মুক্তি।

যোগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে নাথ-যোগদর্শন সম্পর্কে কিছু না বলিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে 'অবাঙ্ মনসোঽগোচরঃ' 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যাদি সংজ্ঞা দিয়া ব্রহ্মের তত্ত্বাতীত অবস্থার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, নাথদর্শন তাহার সহিত তুলনীয়। নাথদর্শনেও পরম চৈতন্য সত্তার কোন নামকরণ করা সম্ভব হয় নাই ; তাই তিনি 'অনামা' নামে অভিহিত। নাথদর্শনে বলা হইয়াছে,—

"যদা নাস্তি স্বয়ং কর্তা কারণং চ কুলাকুলম্।
অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম 'অনামা' বিদ্যতে তদা॥"

ইহা ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণের অতীত অবস্থা। সুতরাং নাথদর্শন একটি অদ্বয় তত্ত্ব। ইহা ভেদ ও অভেদ তত্ত্বের অতীত 'তত্ত্বাতীত' অবস্থা। নাথতন্ত্রে বলা হইয়াছে "তত্ত্বাতীতো নিরঞ্জনঃ।" এই অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পাই চণকবৎ শিব ও শক্তি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি। নাথদর্শনে এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই চিৎশক্তি সম্পন্ন এবং পুরুষের সহিত প্রকৃতি নিত্য সংশ্লিষ্টা। প্রকৃতিকে কিছুতেই পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃতির প্রসর ভাবই সৃষ্টি এবং সঙ্কোচ ভাবই প্রলয়। সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিষ্ক্রিয় করিয়া মনের বিলোপ সাধন ও প্রাণের সংক্ষয় সাধন করিতে পারিলে প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া যান, এবং সমাধি যোগেই তাহা সম্ভব।

যোগীরাট্ গোরক্ষনাথ সমাধি সম্পর্কে বলেন,—

"উভয়োরাত্মনোরেকঃ সমাধিশ্চ বিধীয়তে।
যথা সংক্ষীয়তে প্রাণো মনসশ্চ বিলীয়তে॥"

যোগীব্যক্তি সমাধি অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। যোগী ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া সদা সন্তোষ লাভ করেন। ব্রহ্মানন্দে বিভোর সদা সন্তোষলব্ধ যোগীই যুক্ত যোগী মুক্ত যোগী। কিন্তু নাথদর্শনে এই অবস্থা লাভ বিদেহ অবস্থায় নয়—জীবদ্দশাতেই; নাথ-যোগদর্শন জীবন্মুক্তিবাদী দর্শন। এইখানেই কপিলের সাংখ্য ও পতঞ্জলির যোগদর্শনের সহিত নাথ-যোগদর্শনের পার্থক্য। গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের সহিত ইহার সাদৃশ্য তুলনীয়।

যোগসাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ 'যম' ও 'নিয়ম' সাধনায় নির্মল চরিত্র গঠন, দেবদ্বিজে অনন্যা ভক্তি এবং ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস জন্মে, বহির্মুখী মন ক্রমে অন্তর্মুখী হয়; আত্মচেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা—পরমাত্মা কি—আত্মা কি—আমিই বা কে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান কি? তাহা জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'আসন' ও 'প্রাণায়াম' সাধনার দ্বারা দৃঢ়তা জন্মে, মন একাগ্র হয়, বায়ু পিত্ত কফাদি সমতা প্রাপ্ত হইয়া দেহ সুস্থ, সবল ও সুগঠিত হয়; মুখ মণ্ডলে এক অপার্থিব জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে প্রাণের ক্রিয়াশীলতা বাড়িয়া যায় এবং সাধক দীর্ঘায়ু লাভ করেন। সাধনার তৃতীয় পর্যায়ে 'প্রত্যাহার' সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয়, সাধক সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিবার ক্ষমতা লাভ করেন এবং ইচ্ছামত ইন্দ্রিয় সমূহকে সাময়িক নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবার সামর্থ্য লাভ করেন। সাধনার চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে 'ধারণা' 'ধ্যান' ও 'সমাধি' অভ্যাসে সাধক ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের [illegible]প উপলব্ধি করিতে থাকেন, চিত্তে

বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, এক অপার ও অব্যক্ত আনন্দে মন ভরিয়া উঠে। কুম্ভক প্রভাবে যোগীব্যক্তি মৃত্তিকা সমাধি, জল সমাধি ও শূন্য সমাধি লাভ করিয়া বহু দিন ঐ অবস্থায় কাটাইয়া দিতে সমর্থ হন। যোগীব্যক্তি হন কালজয়ী।

যেমন পুষ্করিণীর জল নির্মল ও নিস্পন্দ হইলে জলের গভীর তলদেশ পর্যন্ত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নির্মল ও একাগ্র চিত্ত যোগীর হৃদয়ে নিকট ও দূর সবই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; যোগী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলই জানিতে পারেন। যোগী দেবস্থলভ পরচিত্ত-জ্ঞান বা অন্তর্যামীত্ব লাভ করেন। যেমন সাধারণ সূর্যকিরণের দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু আতস কাঁচের মাধ্যমে সূর্যরশ্মিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রিভূত করিতে পারিলে তাহার প্রবল দাহিকা শক্তি জন্মে; সেইরূপ বহুমুখী চিত্তকে কোন একটি মাত্র বিষয়ে বা একটি মাত্র বিন্দুতে মিবদ্ধ রাখিতে পারিলে চিত্তের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চিত্তে অতীত স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠে, এমন কি পূর্বজন্মের স্মৃতিও সময় সময় চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কপিলমুনি ও জড় ভরত ছিলেন প্রাচীন যুগের জাতিস্মর পুরুষ। বর্তমান কালেও দুই একজন জাতিস্মরের সন্ধান আমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে পাই। অনেকে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, কিন্তু এই জাতিস্মর ব্যক্তিরাই জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রমাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যেমন কালের গতিতে পদার্থের রূপান্তর ঘটে, যেমন বৃক্ষ রূপান্তরিত হয় প্রস্তরে; সেইরূপ যোগী ব্যক্তি প্রবল ইচ্ছাশক্তিবলে অথবা উৎকট মনোবিকারে অতি অল্প সময়ে পদার্থের ও জীবের রূপান্তর ঘটাইতে সক্ষম হন। গৌতমপত্নী অহল্যার উৎকট মনোবিকারে পাষাণে পরিণত হওয়ার কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। যোগিবর গোরক্ষনাথ স্বীয় গুরু মীননাথকে নারীপ্রেম হইতে উদ্ধার করিতে কদলী রমণীগণকে বা[illegible] করিয়া দিয়াছিলেন।

'গোরক্ষ বিজয়' নামক গ্রন্থে পাই,—

> "এত বলি যতিনাথ হাতে দিল তুড়ি।
> বাদুড় হইয়া সব কদলী গেল উড়ি॥"

সাধনালব্ধ এই সকল দৈবীশক্তিকে যোগশাস্ত্রে যোগবিভূতি বলা হয়।

নির্মল চরিত্রগঠন, সুকান্তিবিশিষ্ট সুস্থ, সবল ও নীরোগ দেহলাভ, মন ও প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং বিভিন্ন যোগ বিভূতি অর্জন ব্যতীত যোগসাধনার আর একটি মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে বলা হয় 'আত্মদর্শন' অর্থাৎ আত্মাকে জানা—আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা। স্বীয় আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলে পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। যোগী-ব্যক্তি স্বীয় আত্মায় ও পরমাত্মায় কোনরূপ ভেদ দর্শন করেন না। আত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অনুভূতিই এবং পরিণামে পরমাত্মায় নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়াই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পরমপদ প্রপ্তি এই পরমগতি লাভ ঈশ্বরের করুণায় বা অনুকম্পায় নয়; সাধক-ব্যক্তি জীবন যজ্ঞের সাধনায় স্বীয় সাধনশক্তি বলে এই পরমপদ—এই পরমগতি অর্জন করিয়া থাকেন।

ভারতের আদি যোগী মুনিঋষিদের প্রতিষ্ঠিত এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি আমরা উদাসীন। ইহার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা দূরে থাকুক কেহ এই পথের পথিক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা যোগের প্রশংসা করিয়া কোন কিছু বলিলে অনেকেই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগসাধনা এমনই এক সাধনা যে উহার সামান্য কিছুও নিয়মিত অনুশীলন করিলে তাহার সুফল অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সযত্নে রক্ষিত হইলে তাহা কোন দিনই বিনষ্ট হয় না।

যোগসাধনার অশেষ মহিমা, বিবিধ গুণ এবং ব্যাপক উদারতা থাকা সত্ত্বেও যোগ-ধর্মটি কেন যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে তাহা

বিস্ময়ের ব্যাপার। ভারতবর্ষে নিয়মিত যোগসাধনা বিলুপ্তপ্রায় হইলেও ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মনীষীরা যোগের মহিমা অবগত হইয়া যোগানুশীলনে ক্রমশঃ তৎপর হইয়া উঠিতেছেন। আশার কথা, অধুনা বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে যোগানুশীলনের কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় সাধনেচ্ছু অনেকেই তথায় যোগানুশীলনের সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। আসাম, ত্রিপুরা, বঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে বহু যোগাশ্রম, যোগমঠ ও মন্দিরাদির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল মঠ-মন্দিরের মহান্ত মহারাজদের নিকট যোগসাধনা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভের আশায় ছুটিয়া গেলে বিফল মনোরথ হইয়া নিদারুণ হতাশা লইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। পাতঞ্জল সূত্র, সাঙ্খ্যযোগসার, যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য, যোগবাশিষ্ট যোগভাস্কর, শিবযোগ, শিবসংহিতা, দত্তাত্রেয় সংহিতা, গোরক্ষ সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, হঠপ্রদীপিকা, অমৃতসিদ্ধি প্রভৃতি বহু যোগশাস্ত্রের সন্ধান মিলিলেও সরল ব্যাখ্যার অভাবে সেগুলির সাহায্যে যোগানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া খুবই কষ্টকর ! উপযুক্ত যোগবিদ্ গুরুর অভাব এবং যোগশাস্ত্রগুলির সহজ সরল ব্যাখ্যা না পাওয়ায়, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে যোগমার্গ অবলম্বন করিতে সাহসী হন না। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সংসার ধর্ম যথারীতি পালন করিয়া যাহাতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিয়মিত যোগানুশীলন করিতে পারেন, আপনাপন পুত্র-কন্যাদের যোগসাধনায় প্রেরণা দিতে পারেন, নৈতিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারেন, সেই বাসনা লইয়াই **'যোগ-সোপান'** গ্রন্থখানি রচনায় প্রবৃত্ত হই। গোরক্ষ সংহিতা, হঠযোগ প্রদীপিকা, শিব সংহিতা, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি যোগশাস্ত্র হইতে এবং মৎগুরু শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী প্রণীত যোগী-গুরু, জ্ঞানী-গুরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সহজসাধ্য পদ্ধতিগুলি—বিশেষ করিয়া যে সকল সাধনা আমি নিজে অভ্যাস করি এবং নিয়মিত অনুশীলন করিয়া সুফল প্রাপ্ত

হইয়াছি, কেবলমাত্র সহজসাধ্য সেই সাধনগুলিই স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলি যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কতখানি সফলকাম হইয়াছি তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। সাধনেচ্ছু গৃহস্থ ব্যক্তিগণ অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই যোগানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য কয়েকটি আসনের চিত্রও গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিত্রের সামান্য দোষ ক্রটি মূল পাঠ দেখিয়া সংশোধন করিয়া আসনগুলি অভ্যাস করিতে অনুরোধ করি। বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থের বেড়াজালে নিজেকে না জড়াইয়া এই গ্রন্থ হইতে ইচ্ছামত দুই একটি সাধন-পদ্ধতি বাছিয়া লইয়া নিয়মিত অভ্যাস করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিগণ যোগসাধনার অমোঘ ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

ছাত্র জীবনেই সৎগুরু পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস মহারাজের নিকট যোগধর্মে দীক্ষালাভ করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার খুল্লতাতই ছিলেন যোগের আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি অনুশীলন দানে আমার শিক্ষক। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী যোগী ও সাধক মহাপুরুষদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া গুরুর আদেশ ক্রমে পুনঃ গৃহে ফিরিয়া আসেন। গৃহবাসী হইয়াও তিনি নিষ্ঠার সহিত সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন এবং সাধনায় রত থাকেন। এই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আশ্রমে স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমার সৎগুরু লাভ হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করায় এবং তাহার দুই বৎসরের মধ্যে আমার খুল্লতাতও তাঁহার সাধনোচিত ধামে গমন করায় গুরুদেবের 'যোগী-গুরু' 'জ্ঞানী-গুরু' 'তান্ত্রিক-গুরু' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থগুলিই আমার গুরুদেবের আসন অধিকার করিয়া থাকে।

আমার এই **যোগ-সোপান** গ্রন্থখানি ১৩৭৭ সালের মাঘ সংখ্যা হইতে মধ্যে মধ্যে 'নাথপন্থ' নামক মাসিক পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে বাহির হইয়াছে। তজ্জন্য আমি 'নাথপন্থ' মাসিক পত্রিকার সর্বময় কর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রীতারকচন্দ্র নাথ মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বর্তমান যুগে এইরূপ সাধন পুস্তকের সবিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়া 'নাথপন্থ'-এর বহু পাঠক যোগ-সোপানটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্র লেখেন। সজ্জন পাঠকমণ্ডলীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া গ্রন্থখানি স্বত পুস্তকাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত করি। ইস্ট বেঙ্গল প্রেসের শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মহাশয় গ্রন্থখানির ভুলভ্রান্তি ও প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকেও আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বর্তমান কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় পুস্তকের দাম কিছু অধিক বিবেচিত হইলেও গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে মূল্য যতদূর সম্ভব কম করা হইয়াছে।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যোগসাধনার ব্যাপক প্রচার উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর অনুমতি লইয়া এই গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ এবং যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারিবেন। যোগধর্ম প্রচার করাই **'যোগ-সোপান'** গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অলমিতি

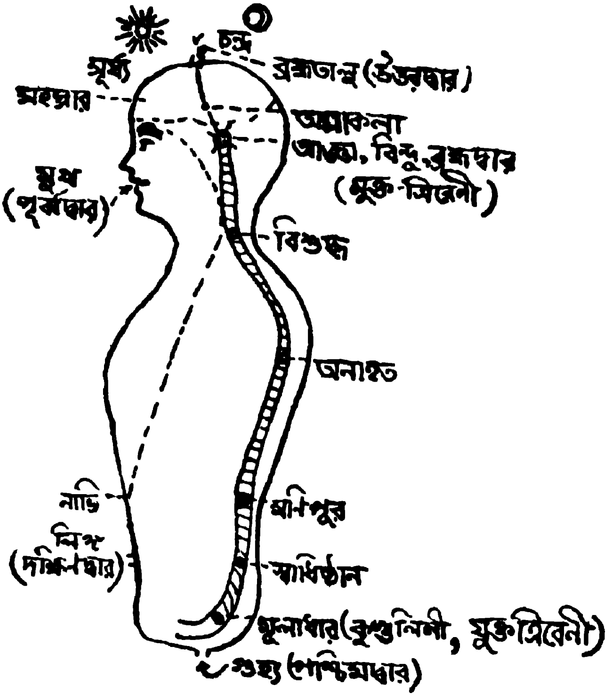
বিনীত—

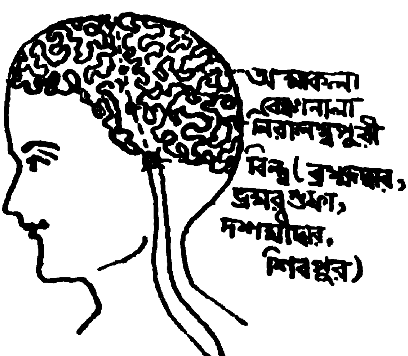
দীন গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

—*—


সূর্য্য
চন্দ্র
ব্রহ্মতালু (উত্তরদ্বার)
মহদ্বার
অমাকলা
আজ্ঞা, বিন্দু, ব্রহ্মদ্বার
(যুক্ত-ত্রিবেণী)
মুখ
(পূর্ব্বদ্বার)
বিশুদ্ধ
অনাহত
নাভি
মণিপুর
লিঙ্গ
(দক্ষিণদ্বার)
স্বাধিষ্ঠান
মূলাধার (কুণ্ডলিনী, যুক্তত্রিবেণী)
গুহ্য (পশ্চিমদ্বার)


অমাকলা
বঙ্কনালা
নিরালম্বপুরী
বিন্দু (ব্রহ্মদ্বার,
ভ্রমরগুহা,
দশমদ্বার,
শিবপুর)

যোগ চক্র

ওঁ

যোগ-সোপান

ওঁ বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহায় ত্রিবেদী দিব্য চক্ষুষে।
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥

জ্ঞানই ব্রহ্ম

জ্ঞানই পরম সত্য বস্তু। মানবেতর জীবে জ্ঞান সীমায়িত, কিন্তু মানবজীবনে তাহা ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশশীল। মানব তাই জ্ঞানের সাধক। সভ্যতার আদিম কাল হইতে মানব জ্ঞানের সাধনা করিয়া আসিতেছে, আজিও তাহার শেষ হয় নাই—কোন দিন হইবেও না। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত,—

"একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্ত শূন্যং নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যম্।"
শিব সংহিতা। ১।১

জ্ঞান নিত্য সত্য বস্তু, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন সত্য বস্তু নাই। তাই জ্ঞানই পরমতত্ত্ব, জ্ঞানই ব্রহ্ম, জ্ঞানই পরমাত্মা, জ্ঞানই ভগবান।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥
শ্রীমদ্ভাগবত। ১।২।১১

সাঙ্খ্যকার কপিলের মতে জ্ঞানই মুক্তির পথ।

"বিবেক খ্যাতিস্তু হানোপায়ঃ।"—সাঙ্খ্য দর্শন।

যোগী পতঞ্জলিও বলিয়াছেন,—

"তত্র নিরতিশয়ং জ্ঞানং"—পাতঞ্জল দর্শন।

কিন্তু জ্ঞানের এই দার্শনিক তত্ত্ব পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। তাই মহামতি বেকনের "Knowledge is power" এই মহাবাণী সেদিন সমগ্র ইউরোপে এক নব চেতনার সূচনা করিয়াছিল,—করিয়াছিল বিজ্ঞানের সূত্রপাত।

জ্ঞান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি বিজ্ঞান, অপরটি প্রজ্ঞান বা প্রজ্ঞা। বিজ্ঞান বলে মানব কত অসাধ্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। কাল যাহা ছিল দূর, আজ তাহা নিকট; কাল যাহা ছিল অজেয়, আজ তাহা বিজিত; কাল যাহা ছিল অজানা, আজ তাহা জ্ঞাত; কাল যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, বিজ্ঞান-বলে আজ সে সমস্তই সম্ভব হইতেছে।

প্রজ্ঞান সাধনলভ্য। এই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উন্মেষের জন্য যেখানে দেহাতিরিক্ত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে সেখানেই কর্মকাণ্ডের উৎপত্তি। বৈদিক যাগযজ্ঞ, উপাচার বহুল পৌরাণিক পূজাপাঠ এবং গীত ভজনাদি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। আর জ্ঞানের উন্মেষের জন্য বাহ্য বস্তুর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া একমাত্র দেহকেই যেখানে অবলম্বন করা হইয়াছে সেখানেই যোগের উৎপত্তি। যোগলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাও মানব বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। অনেক অলৌকিক কার্যকলাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানীর নিকট আজও বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বিজ্ঞানী জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্যাস সঙ্গে লইয়া অথবা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করতঃ

তাহাতে কৃত্রিম বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বায়ুহীন স্থানে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; আর যোগী পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে অথবা ভূগর্ভে অক্সিজেন ব্যতিরেকে অতিবাহিত করিয়াছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। বিজ্ঞানী পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বাহিরে গিয়া শূন্যে বিচরণ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন আর যোগী যোগবলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গণ্ডির মধ্যেই অবাধে শূন্যে বিচরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানীর নিকট প্রজ্ঞানীর এই সকল কার্যকলাপ আজও পরম বিস্ময়।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়ই প্রকৃতি জয়ী। বিজ্ঞান সাধনায় প্রয়োজন নানা যন্ত্রপাতি ও হিসাব নিকাশ। আর প্রজ্ঞান সাধনায় প্রয়োজন সুস্থ দেহ-মন। মনের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোন কারণে দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে মনও তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া ফেলে, আবার হঠাৎ কোন মানসিক অশান্তি উপস্থিত হইলে ক্রমে দেহও অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাই মানস সাধনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেহ সাধনের বা কায়াসাধনার।

নাথযোগ মতে এই কায়াসাধনার কথা রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়া নানা ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সবল সুস্থ দেহ না হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। যাঁহারা নাথপন্থের যোগী তাঁহারা সর্বাগ্রে ধৌতি বস্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম নামক ছয়টি প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া প্রাণায়ামে সিদ্ধি লাভের অতি সহজ ও সুগম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কারণে অনেকেই নাথযোগীদের হঠযোগী বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ নাথ-যোগীরা কেবলমাত্র হঠযোগী নন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য রাজযোগ সাধন। কিন্তু রাজযোগ সাধন করিতে হইলে হঠযোগ সাধন অপরিহার্য,—

"হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।"

সেইজন্য নাথযোগীরা প্রথমে হঠযোগ সাধন করিয়া দেহকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া পরে রাজযোগ সাধনায় যত্নবান হয়েন। নাথযোগ মতে সাধনার ক্রমপর্যায় হইল প্রথমে মানব তনু হইতে সিদ্ধতনু, পরে সিদ্ধতনু হইতে দিব্যতনু এবং পরিশেষে দিব্যতনু হইতে প্রণবতনুতে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ। নাথযোগীরা সেইজন্য অগ্রে কায়া সাধনার নির্দেশ দিয়াছেন। কায়াসাধন ও কায়াসাধনার কয়েকটি সহজতর উপায় বলিবার পূর্বে যোগ কি? যোগের সংজ্ঞা কি? যোগসাধন বলিতেই বা আমরা কি বুঝি তাহা অগ্রে জানা প্রয়োজন।

যোগ কি?

১+১=২, ১+১+১ অথবা ১+২=৩ এই যোগের কথা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু, সাধন মার্গে যোগ হইল ১+১=১, ১+১+১ অথবা ১+২=১। আপনারা হয়তো বলিবেন যে ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? দুই বিষয়ের বা দুই বস্তুর একীকরণের নাম যোগ সত্য; কিন্তু এই সংযুক্তিতে যখন একটি আর একটিতে নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলে তখন একটি মাত্র বস্তুই পরিলক্ষিত হয় বা একটি মাত্রকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তখন ১+১=১ হয় বৈ কি। এক ঘটী দুগ্ধ সাগরের জলে ঢালিয়া দিলে পর আপনি সাগরের জলে এক বিন্দু দুগ্ধকেও আর খুঁজিয়া পাইবেন না, দুগ্ধ তাহার রূপ ও গুণ সবই সাগরের মাঝে হারাইয়া ফেলিয়া সাগর হইয়া গিয়াছে। দুগ্ধের সত্তা সাগরের সত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। সাধন মার্গে সাধক তাঁহার ইষ্ট ধ্যেয় বস্তুতে নিজেকে সংযুক্ত করেন অর্থাৎ নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। নিজ সত্তা পরমসত্তায় বিলীন করিয়া দেন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে এইরূপ সংযুক্তিই 'যোগ' নামে অভিহিত।

যোগের সংজ্ঞা কি?

যোগ শব্দের অর্থ ব্যাপক। বহু অর্থেই যোগ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে যোগ শাস্ত্রে অল্প কয়েকটি অর্থ গৃহিত হইয়া থাকে। যোগী পতঞ্জলি বলেন,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" পাতঞ্জল দর্শন। চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধ সাধনের নাম যোগ। চিত্ত সদাই চঞ্চল, চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত ক্রমাগত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। এই চঞ্চল চিত্তকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিয়া একটি মাত্র ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করিয়া তাহাতেই চিত্তের বিলোপ সাধনই যোগ। চলিত ভাষায় ইহাই চিত্তের 'আনমন' বা অমনস্ক অবস্থা। যোগশাস্ত্র বলেন,—

"সর্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।"

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

—যাজ্ঞবল্ক্য

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধনই যোগ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা এরূপভাবে সংযুক্ত হয় যে তখন জীবাত্মার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকেনা। একটি আর একটিতে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত,—

যোঽপান প্রাণযোর্যোগঃ স্বরজোরেতসোস্তথা।
সূর্য্যশ্চন্দ্র মসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥
এবন্তু দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগোযোগ উচ্যতে॥

—যোগবীজ

প্রাণ ও অপান বায়ু, রজ ও রেত অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু, সূর্য্য ও চন্দ্র অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়ীর শ্বাস এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার

সংযোগ সাধনের নাম যোগ। সাধন মার্গে সাধারণতঃ এই সকল সংযুক্তিই যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে।

যোগ বলিতে আমরা কি বুঝি ?

যাহা চর্মচক্ষু দিয়া দেখা যায় তাহা দর্শন নহে। যাহা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখা হয়, তাহাই দর্শন। দর্শন বহু, তন্মধ্যে ছয়টি দর্শনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলে।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েবহি॥

গৌতমের (নামান্তর অক্ষপাদ) ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিকদর্শন, কপিলের সাঙ্খ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগদর্শন, ব্যাসের বেদান্তদর্শন, এবং জৈমিনীর মীমাংসাদর্শন। সুতরাং যোগ একটি দর্শন। কিন্তু কিরূপ দর্শন? ইহা আত্মদর্শন—নিজের স্বরূপ দর্শন, পরম সত্যের দর্শন, পরমাত্মার দর্শন, এক কথায় ব্রহ্ম দর্শন। যোগিগণ ললাটে একটি জ্ঞানচক্ষু কল্পনা করিয়া থাকেন। সাধকের পুণ্যফলেই বলুন আর সাধন বলেই বলুন যখন এই জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তখন সেই প্রজ্ঞালোকে দূর ও নিকট, ভূত ও ভবিষ্যৎ সকলই সাধকের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; সাধক তখন সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। সে জ্ঞান পুস্তক-পাঠ জনিত জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান গুরুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ জনিত জ্ঞানও নহে, সে জ্ঞান সাধন বলে সাধকের অন্তরে স্বয়ং উদ্ভাসিত জ্ঞান,—সে জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান। তাই জ্ঞানই ব্রহ্ম। এবং এ জ্ঞান যোগলব্ধ জ্ঞান। সুতরাং যোগ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটি প্রকৃষ্ট মার্গ। যোগের শেষ অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি। যোগিগণ তাই বলেন "সমাধি ব্রহ্মণিস্থিতি।"—পাতঞ্জল।

যোগী কে ?

অনেকের ধারণা যে সংসারে থাকিয়া যোগধর্মাচরণ বা যোগসাধনা করা যায় না, যোগসাধনা করিতে হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনবাসী বা আশ্রমবাসী হইতে হয়। কিন্তু এ-ধারণা ভ্রান্ত ; স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির মধ্যে থাকিয়া সংসারধর্ম যথারীতি পালন করিয়া যোগসাধনার দ্বারা জীবনে উৎকর্ষতা লাভ করা যায়। মানব মাত্রই প্রত্যেকে অল্পবিস্তর যোগী। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই এ সত্যতা হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিবেন। কোন এক বিশেষ চিন্তায় কেহ গভীরভাবে নিমগ্ন থাকা কালে তাঁহার সমীপে অপর ব্যক্তিরা বাক্যালাপ করিলে ঐ ব্যক্তি তাহা শুনিতে পান না। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় না। পরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে, যখন তাঁহাকে ঐ বিষয় প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন যে তিনি তো কিছুই শুনেন নাই বা শুনিতে পান নাই। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, ঐ ব্যক্তির শুনিতে না পাওয়ার কারণ কি হইতে পারে। কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকাকালে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহার মনের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটায় তিনি শুনিতে পান নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এই বিচ্ছিন্ন ভাবই যোগশাস্ত্রে যোগাঙ্গ—'প্রত্যাহার' নামে অভিহিত। "ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথঃ"। মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ সাধন না হইলে ঐ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিকা শক্তি থাকে না, এই জন্যই মন ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রধান। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এই সংযোগ-সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদ অবস্থাটি আপনারা অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি আমার উক্তির সত্যতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে মানব মাত্রই অল্পবিস্তর যোগী। এ অবস্থা বালকদের মধ্যেও অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি সংসারধর্ম যথারীতি পালন করিয়াও যোগসাধনের অধিকারী হইতে পারেন। যোগশাস্ত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যথা :—

"গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদিপূর্ণো সঙ্গং ত্যক্ত্বাচান্তরে যোগমার্গে।
সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ ক্রীড়েৎ সো বৈ সম্মতং সাধয়িত্বা॥
শিব সংহিতা—৫।২১২

অর্থাৎ পুত্রদারাদিসম্পন্ন যে গৃহস্থ গৃহে থাকিয়াও অন্তরে তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হয় সেই গৃহী পশ্চাৎ আপন সিদ্ধির চিহ্ন দেখিতে পায় সম্মত সাধনা করিয়া সেই সাধক সর্বদা ক্রীড়া করেন।

যোগসাধনা করিতে হইলে গৃহস্থ সাধককে তাঁহার আহার বিহার বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা ও বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। রাত্রির শেষ ভাগে অর্থাৎ চতুর্থ প্রহরে যোগসাধক ব্যক্তি নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। এ বিষয়ে তুলসীদাসের একটি পদ আছে, পাঠকের অবগতির জন্য তাহা লিখিলাম—

"পৈলা প্রহর সব কৈ জাগে দোসরা প্রহর ভোগী।
তিসরা প্রহর তস্কর জাগে চৌঠা প্রহর যোগী॥"

যোগসাধক ব্যক্তি নিত্য পঞ্চস্নানে অভ্যস্ত হইবেন। পঞ্চস্নান হইতেছে,—ভৌম, সৌর, বায়বীয়, বারুণী ও মানস।

১। ভৌমস্নান—গাত্রে মৃত্তিকা লেপন অথবা বিভূতি (ভস্ম) লেপন করিয়া কিছু সময় অবস্থান।

২। সৌরস্নান—নগ্ন গায়ে উদীয়মান সূর্যের রক্তিমাভ রশ্মির দ্বারা অবগাহন।

৩। বায়বীয় স্নান—সর্বাঙ্গে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন।

৪। বারুণীস্নান—জলে অবগাহন রূপ স্নানকে বরুণস্নান বা বারুণীস্নান বলে।

৫। মানসস্নান—আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া নয়ন যুগল মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যেন চন্দ্রচূড়ের জটাজাল হইতে জাহ্নবীধারা নিজ মস্তকে পতিত হইয়া সর্বাঙ্গ বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রৌদ্রে ভ্রমণজনিত শরীর উত্তপ্ত হইলে বা কোন কারণে শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিলে এই মানসস্নানে সবিশেষ ফল পাইবেন, অল্প সময়ের মধ্যে শরীর শীতলতা প্রাপ্ত হইবে।

যোগসাধক ব্যক্তি একটানা অধিক পথ পদব্রজে ভ্রমণ এবং অধিক কায়িক পরিশ্রম পরিহার করিতে চেষ্টা করিবেন। অধিক বাক্যালাপ ও তর্ক-বিতর্কে যোগদান না করিয়া বাক্-সংযমী হইতে চেষ্টা করিবেন। আহার ও নিদ্রার পরিমাণ সীমিত করিতে চেষ্টা করিবেন। আহার সম্পর্কে যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বুলং চূর্ণবর্জ্জিতম্।
কর্পূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকম্॥

—শিবসংহিতা, ৩।৩৫

ইহা ব্যতীত যোগসাধক ব্যক্তি নিরামিষ ভোজন করিবেন।

অপিচ—

অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কং।
উদরস্য চতুর্থাংশং সংরক্ষেদ্‌বায়ুচারণে॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা, ৫।২২

অন্নাদি আহার্যের দ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ, পানীয় জল দ্বারা তৃতীয়াংশ পূরণ করিবেন এবং চতুর্থাংশ বায়ু চলাচলের জন্য খালি রাখিবেন। অবিবাহিত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন এবং যাঁহারা বিবাহিত তাঁহারা মাসে একবার স্ত্রী সহবাস করিবেন।

"মাস মধ্যে একদিন বৎসরেতে বার।
ইহাতে যতেক বাছা কমাইতে পার॥
মাসে মাসে ঋতুমতী শাস্ত্রের লিখন।
তাহে কুলক্ষণ যদি না কর রমণ॥"

যোগীকাচ, পৃষ্ঠা—১৯৩

অপিচ "ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ॥"

—মহাভারত

এই নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিলে ঐ গৃহস্থ ব্যক্তিও ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত হয়েন।

পূর্বেই বলিয়াছি যোগসাধনা দেহকেন্দ্রিক সাধনা, সেইজন্য যোগিগণ আপন দেহকে ব্রহ্মাণ্ড মনে করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে আপন দেহের মধ্যেই কল্পনা করিয়া থাকেন। যোগসাধনা করিতে হইলে ঐ সকলের অবস্থান জানা প্রয়োজন। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
সরিতা সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টি সংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশি ভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়॥

—শিবসংহিতা, ২।১—৫

অর্থাৎ এই জীবদেহে সপ্তদীপের সহিত সুমেরু পর্বত অবস্থান করে, এবং সমস্ত নদনদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপালগণও অবস্থান

করে। ঋষিগণ, মুনিগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতাগণ এই দেহে নিত্য অবস্থান করিয়া থাকেন। সৃষ্টি সংহারকারক রবি-শশী এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতও অবস্থান করিতেছে। অধিক কি কথা, স্বর্গ মর্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবন মধ্যে যত জীব আছে সে সকলই মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপনাপন কার্য সম্পাদন করিতেছে; যিনি এই সকল বৃত্তান্ত সম্যগ্ অবহিত থাকেন তিনিই যোগী, ইহাতে সংশয় নাই।

সাধন প্রণালী আলোচনা কালে ত্রিলোকের এই সমস্ত বৃত্তান্ত দেহ ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি ভাবে আছে, প্রয়োজন স্থলে বর্ণনা করা হইবে। ইহা ব্যতীত ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য, ব্যোম পঞ্চক গ্রন্থিত্রয়, শক্তিত্রয় প্রভৃতিও যোগসাধক ব্যক্তির জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন স্থলে এইগুলিরও বিশদ আলোচনা করা হইবে।

যোগের প্রকার ভেদ

সদাশিব পঞ্চানন কর্তৃক দশবিধ যোগের কথা বলা হইলেও যোগশাস্ত্রে চারিপ্রকার যোগই প্রচলিত—

মন্ত্রযোগোহঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥

—শিবসংহিতা, ৫।৯

মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও দ্বৈতাদ্বৈতভাববিবর্জিত রাজযোগ। মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক যোগের সঙ্গেই লয়যোগের কিছু না কিছু সম্বন্ধ বর্তমান আছে।

মন্ত্রযোগ

মন্ত্র জপাত্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।

সিদ্ধমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, কোন দেবদেবীর বীজমন্ত্র, গায়ত্রী বা সাবিত্রীমন্ত্র অথবা কেবলমাত্র প্রণব বা 'সোঽহং মন্ত্র জপ করিতে করিতে চিত্তের লয় সাধন করাই মন্ত্রযোগ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এই যোগের প্রবক্তা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ভৃগু, দধীচি, জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ এই যোগের উপদেষ্টা। সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন বর্তমান যুগের সিদ্ধ মন্ত্রযোগী। ব্রহ্মানন্দগিরি স্বীয় গুরুর নিকট অশুদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও প্রবল মনোবলে ও একান্ত ইচ্ছাশক্তি বলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া মন্ত্রযোগের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

হঠযোগ

'হ' শব্দে সূর্য, প্রাণ বায়ু ও পিঙ্গলা নাড়ীকে বুঝায় এবং 'ঠ' শব্দে চন্দ্র, অপান বায়ু ও ইড়া নাড়ীকে বুঝায়। তাহা হইলে সূর্য ও চন্দ্র, প্রাণ ও অপান বায়ু এবং পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়ীর সংযোগ সাধনের নাম হঠযোগ। ষট্ কর্মের দ্বারা কায়া সাধন এবং অষ্টবিধ প্রাণায়াম সাধনই হঠযোগ সাধনের সহায়। প্রাণায়ামের সাহায্যে অগ্রে ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিতে পারিলে মন আপনা হইতেই বশীভূত হইয়া যায়। মহাযোগী মার্কণ্ডেয়, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য, যোগিবর গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগিগণ হঠযোগী বলিয়া খ্যাত। হঠযোগ দুই প্রকার। একটির প্রবর্তক মার্কণ্ডেয় মুনি

এবং অপরটির প্রবর্তক গোরক্ষ মুনি। মার্কণ্ডেয় মুনির মতে যোগাঙ্গ আটটি এবং গোরক্ষ মুনির মতে যোগাঙ্গ ছয়টি। যোগাঙ্গের বিষয় পরে আলোচিত হইবে। দুই প্রকার হঠযোগের কথা বলি —

দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদি সুসাধিতঃ।
অন্যো মৃকণ্ডুপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ॥

গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত হঠযোগ কষ্টসাধ্য, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব। মার্কণ্ডেয় মুনি প্রবর্তিত হঠযোগ সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ।

লয়যোগ

যে কোন বস্তুতে বা বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া ক্রমে চিত্তের বিলোপ সাধন করার নাম লয়যোগ। সুতরাং লয়যোগ বহুবিধ।

সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলয়বিধানানি বসন্তি লোকে।
—যোগতারাবলী

সদাশিব এই লয়যোগের প্রবক্তা বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। গৃহস্থ সাধকগণের পক্ষে লয়যোগ সাধনই সহজতম ও উৎকৃষ্ট। লয়যোগ সাধনে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে ফল লাভ করা যায়। যোগীগুরু ঘেরণ্ড লয়যোগ সিদ্ধির চারিটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন —

শাম্ভব্যা চৈব ভ্রামর্য্যা খেচর্য্যা যোনিমুদ্রয়া।
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্বিধা॥
—ঘেরণ্ডসংহিতা, ৭।৫

শাম্ভবীমুদ্রাদ্বারা ধ্যান, ভ্রামরীকুম্ভকদ্বারা নাদ শ্রবণ, খেচরীমুদ্রাদ্বারা রসাস্বাদন এবং যোনি মুদ্রাদ্বারা আনন্দভোগ, এই চারিপ্রকার সাধন দ্বারাই লয়যোগ সিদ্ধি হয়।

ন খেচরীসমা মুদ্রা ন নাদসদৃশো লয়ঃ।

—শিবসিংহিতা, ৫।৩০

ভ্রামরীকুম্ভকদ্বারা নাদ শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তের বিলোপ সাধনই যোগীদের মতে শ্রেষ্ঠ লয়যোগ। আচার্য শঙ্কর তাঁহার যোগতারাবলী স্তোত্রে বলিয়াছেন—

নাদানুসন্ধান সমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়ানাম্

রাজযোগ

রাজযোগ দ্বৈতাদ্বৈতভাববিবর্জিত সমতত্ত্ব। অগ্রে মনকে জয় করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়সমূহ তথা জগৎ-প্রকৃতি আপনি বশীভূত হয়। এইজন্য রাজযোগ সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজযোগের প্রবক্তা দেবাদিদেব সদাশিব বলেন—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতম্॥

—কুলার্ণবতন্ত্র, ৫।১।১১০

অপিচ—রাজত্বাৎ সর্ব্বযোগানাং রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ॥

রাজযোগ সাধকগণের মধ্যে যোগীগুরু দত্তাত্রেয় প্রধান।

দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ব্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগো মনোবায়ু স্থিরৌ কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥

রাজযোগ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যোগীগুরু দত্তাত্রেয়ের নিকট গোরক্ষনাথের রাজযোগ শিক্ষারূপ যে দ্ব্যর্থক কাহিনীটি প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, উহাতে রাজযোগ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ হইতে পারে।

একদা সৌরাষ্ট্রের গিরণার পর্বতে মহাযোগী দত্তাত্রেয়ের সঙ্গে গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎকার হয়। নানা বাক্যালাপের পর কে বড় এই লইয়া প্রশ্ন উঠে, তখন লুকোচুরি খেলায় উভয়েই সম্মত হন। অর্থাৎ এক জন লুকাইবেন অপর জন খুঁজিয়া বাহির করিবেন। প্রথমে গোরক্ষনাথ হাতে তিনটি তালি দিয়া শূন্যে অন্তর্হিত হইলেন। যোগিবর দত্তাত্রেয় স্বীয় আসনে ধ্যানে বসিয়া মুহূর্তের মধ্যে যোগিবর গোরক্ষনাথকে ধরিয়া ফেলিলেন। গোরক্ষনাথ দেখিলেন যে তিনি দত্তাত্রেয়ের করতলে একটি ক্রীড়নক রূপে অবস্থান করিতেছেন। এইবার দত্তাত্রেয় আকাশে লুকাইলেন, গোরক্ষনাথ হংসরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িলেন, ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়াও দত্তাত্রেয়ের সন্ধান পাইলেন না। শেষে ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিষণ্ণ মনে স্বীয় আসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে দত্তাত্রেয় গোরক্ষনাথের সম্মুখে প্রকট হইলেন। গোরক্ষনাথ তাঁহাকে আর একবার লুকাইতে অনুরোধ করিলেন। দত্তাত্রেয় স্মিত হাস্যে পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। গোরক্ষনাথ এবারও সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া দত্তাত্রেয়কে দেখিতে না পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যখন কিছুই নাই তখন দত্তাত্রেয় গেলেন কোথায় এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া জানিতে পারিলেন যে যোগিবর দত্তাত্রেয় তাঁহারই কমণ্ডলু মধ্যে লুকাইয়া আছেন। তিনি ক্ষুদ্র মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কমণ্ডলুর জলে দত্তাত্রেয়কে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু খুঁজিয়া না পাইয়া লজ্জিত হইয়া অধোবদনে স্বীয় আসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজযোগী দত্তাত্রেয় সহাস্য বদনে

গোরক্ষনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোরক্ষনাথ সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আকাশে লুকাইলে সারা আকাশ খুঁজিয়াও এবং কমণ্ডলুর জলে লুকাইলে কমণ্ডলুর সারা জল তোলপাড় করিয়াও আপনাকে পাইলাম না, ইহার কারণ কি? দত্তাত্রেয় বলিলেন, আমি আকাশে আকাশ এবং জলে জল হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম, এবং আপনি হংসরূপে ও মৎস্যরূপে যথাক্রমে আকাশে ও জলে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমাকে দেখিতে পান নাই। পাঠক! বুঝিলেন ব্যাপারখানা কি? এই সমতত্ত্বই রাজযোগ। সর্বত্র সমদর্শন, সমভাব, সমান অনুভূতিই—এক কথায় সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শনই রাজযোগের শিক্ষা। রাজযোগ ও হঠযোগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত—

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।

—শিবসংহিতা, ৫।১৮১

যোগাঙ্গ

যোগের প্রকার ভেদ আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে যোগের অঙ্গগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। মার্কণ্ডেয়, যাজ্ঞবল্ক্য, পতঞ্জলি প্রভৃতি সিদ্ধ যোগী-পুরুষগণের মতে যোগের অঙ্গ আটটি। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় স্ত্রী গার্গীকে যোগোপদেশ প্রদান কালে বলিতেছেন—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৪৫

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের অঙ্গ এই আটটি। যোগসাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগের এই আটটি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে সাধনা বা অভ্যাস করিতে হয়।

অপর পক্ষে যোগিবর গোরক্ষনাথের মতে যোগের অঙ্গ ছয়টি, যথা—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥
—গোরক্ষসংহিতা, ১।৫

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টিকে যোগাঙ্গ বলিয়া জানিবে। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম দুইটি অঙ্গ 'যম' ও 'নিয়ম'-কে গোরক্ষনাথ মুনি যোগাঙ্গ হইতে বাদ দিয়াছেন। তাঁহার মতে যম ও নিয়ম সাধনার সহিত যোগের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। তিনি বলেন, আদর্শ চরিত্র গঠন ও শান্তিময় জীবন যাপন করিতে হইলে প্রত্যেক মানবেরই যম ও নিয়মের অনুশীলন করা প্রয়োজন। যম ও নিয়মের আলোচনা কালে যোগিবর গোরক্ষনাথের এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। যম ও নিয়মকে যোগাঙ্গ হইতে বাদ দিলেও যোগিবর গোরক্ষনাথ শরীর শোধনের জন্য ছয়টি যোগাঙ্গের সহিত ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক্ ও কপালভাতি নামক ষট্‌কর্ম্ম এবং কয়েকটি মুদ্রা এই সপ্ত সাধনার নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ধৌতির্ব্বস্তিস্তথা নেতি লৌলিকিস্ত্রাটকস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্ কর্ম্মানি সমাচরেৎ॥
—গোরক্ষসংহিতা, ৪।৯

বিশেষ বিশেষ সাধনায় বিশেষ বিশেষ মুদ্রা সাধনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং সাধন পদ্ধতি আলোচনা কালে মুদ্রাগুলির নাম ও অভ্যাস

প্রণালী বর্ণনা করিব। এক্ষণে যোগাঙ্গের প্রথম অঙ্গ 'যম' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি।

যম

যোগী পতঞ্জলি বলিতেছেন—

অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

—পাতঞ্জলদর্শন, ২।৩৯

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকার সাধনার নাম 'যম' সাধন।

(ক) অহিংসা—

প্রথমেই বলিয়া রাখি যোগশাস্ত্রে অহিংসা সত্যাস্তেয়াদির অর্থ ব্যাপক এবং সাধনাও সময় সাপেক্ষ। প্রাণীবধ না করাকেই আমরা অহিংসা বলি, বস্তুতঃ পক্ষে কায়িক, বাচিক ও মানসিক কার্যের দ্বারা কোন প্রাণীকে ব্যথিত না করাই অহিংসা। প্রকৃত অহিংসানুষ্ঠান করিতে হইলে মনে মনেও কাহার প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করিতে নাই। কাহারও প্রতি ক্রোধ বা হিংসা ভাবের উদয় হইলে স্বীয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া আত্মনিগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ অভ্যাসে অল্পকাল মধ্যেই অন্তরে শুদ্ধ ধর্মভাবের উদয় ও নৈর্মল্যশক্তি লাভ হইবে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগ কালে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবেন এবং সন্তর্পণে দিনযাপন করিবেন, গতকাল যে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা জীবনে ঘটিয়াছে,—যাহার জন্য অপরে কোনরূপ কায়িক, বাচিক ও মানসিক আঘাত পাইতে পারেন, আজ যেন সেইরূপ অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে। রাত্রে শয্যা গ্রহণ কালে

স্বীয় দৈনন্দিন কার্যের সমালোচনা করিয়া দেখিবেন—ভাবিবেন আজ যাহা যাহা করিয়াছি, যাহা যাহা বলিয়াছি এবং মনে মনেও যাহা যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে অপরকে কি আঘাত করিয়াছি? কাহাকেও কি ব্যথা দিয়াছি? যদি ঐরূপ কিছু করিয়া থাকি; যদি ঐরূপ কিছু ঘটিয়া থাকে, তবে আগামী দিনে যাহাতে ঐরূপ আর না ঘটে তাহার জন্য সদাই সচেতন থাকিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবেন। এইরূপ ক্রিয়াযোগের অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে মন হইতে হিংসার ভাব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহাই অহিংসা সাধন। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে অহিংসাসাধনায় সিদ্ধ হইলে হিংস্র জীবও তাঁহার নিকট হিংসা ভুলিয়া যায়—

'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।'

—পাতঞ্জলদর্শন, ২।৩৫

হিংসাজয়ী সদাশিব তাই অহিভূষণ এবং মাতা পার্বতী সিংহ-বাহিনী।

(খ) সত্য—

যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত ঘটনাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করাই সত্যাচরণ। কোন কিছু প্রকাশ করিবার কালে কোনরূপ কপটতার বা দ্ব্যর্থক ভাষার আশ্রয় লইতে নাই। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কপটতার আশ্রয় লইয়া 'অশ্বথামা হত ইতি গজঃ' রূপ কপট সত্য কথা বলার জন্য ক্ষণকাল নরকবাসী হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। বাক্ সংযমই সত্যসাধনের উৎকৃষ্ট পথ। সত্যবাদী কে? শঙ্করাচার্যকে এই প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'মৌনাবলম্বীই সত্যবাদী'। সত্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বাক্‌সিদ্ধ হন। শুনিয়াছি দ্বাদশবর্ষ মৌন থাকিতে পারিলে বাক্‌সিদ্ধ হওয়া যায়।

পাঠক, ক্ষমা করিবেন, তাই বলিয়া বোবা ব্যক্তিকে এই মৌনী পর্যায়ভুক্ত করিবেন না।

(গ) **অস্তেয়**—

অস্তেয় বা অচৌর্যের কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আমরা সাধারণতঃ বুঝি, না বলিয়া পরদ্রব্য গ্রহণকে চৌর্য বলে; কিন্তু যোগশাস্ত্রে ইহার অর্থ ব্যাপক। পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছাও চৌর্য পর্যায়ভুক্ত। অন্যের কোন বস্তু দেখিলাম, উহা নিজের নাই, আমাকেও একটি সংগ্রহ করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তাও অস্তেয় সাধনার অন্তরায়। আমার যাহা প্রাপ্য ছিল তাহাই পাইয়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই, এই আত্মতৃপ্তিই অস্তেয় সাধনার উৎকৃষ্ট পথ; ফলকথা সদা সন্তোষ ভাবই অস্তেয়। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনই ধনরত্নের অভাব হয় না।

(ঘ) **ব্রহ্মচর্য** –

"বীর্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।"

রেতঃপাত না ঘটাইয়া সযত্নে উহা স্বশরীরে ধারণ করার নাম ব্রহ্মচর্য। বড়ই কঠিন কাজ। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেও ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না। প্রকৃত ব্রহ্মচারী হইতে হইলে অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগের অভ্যাসে যত্নবান্ হইতে হইবে। অষ্টবিধ মৈথুন হইতেছে—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

—দক্ষস্মৃতি, ৭।৩২-৩৩

ভোগলিপ্সায় কোন স্ত্রীলোকের স্মরণ, গুণকীর্তন, কেলি অর্থাৎ মেলামেশা, দর্শন, গুহ্য আলাপন, মনে মনে মিলনের সঙ্কল্প, উদ্যোগ এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই গুলিই অষ্ট প্রকার মৈথুন বলিয়া জানিবেন। এইগুলির বর্জন বা বিপরীতই ব্রহ্মচর্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"কর্ম্মনা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥"

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬২

অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য। শুক্রধারণ করিয়া ঊর্ধ্বরেতা হইতে পারিলে ব্রহ্মতেজে শরীর ও মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। মানব হন দেবতা। জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন,—

"ঊর্ধ্বরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।"

এখন প্রশ্ন আসে যে সংসারী ব্যক্তির এরূপ ব্রহ্মচারী হইবার সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্রেই ইহার মীমাংসা আছে। মহাভারতের শান্তি পর্বে একটি শ্লোকে আছে,—

"ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।"

গৃহস্থ যোগসাধক ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীগমন না করিলে ব্রহ্মচারীরূপে গণ্য হন। গৃহস্থ যোগীদের প্রতি সিদ্ধযোগিগণ উপদেশ দিয়াছেন—

"মাস মধ্যে একদিন বৎসরেতে বার;
ইহাতে যতেক বাছা কমাইতে পার।
মাসে মাসে ঋতুমতী শাস্ত্রের লেখন,
তাহে কুলক্ষণ যদি না কর রমণ॥"

—যোগীকাচ, পৃষ্ঠা ১৯৩

যাঁহারা পাক্ষিক, সপ্তাহিক বা সপ্তাহে একাধিকবার স্ত্রী গমন করিয়া থাকেন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উহা কমাইতে অভ্যাস করিবেন। পৃথক ঘর হইলে ভাল হয়, নতুবা একই ঘরে স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করিবেন। স্ত্রীকে সাধন মার্গে সঙ্গিনী করিয়া লইবেন। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মচর্য সাধনের একটি যৌগিক উপায় বলিতেছি, অতি সাবধানে উহার অভ্যাস করিবেন। যখন বেগে মূত্র নির্গমন হইতে থাকিবে সেই সময় ঐ বেগকে রোধ করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন মূত্র ত্যাগ ও মূত্ররোধ ইচ্ছাধীন হইয়া যাইবে তখন ব্রহ্মচর্য সাধন বা বীর্যধারণ করার ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইবে।

(ঙ) **অপরিগ্রহ**—

দেহরক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করার নাম অপরিগ্রহ। বস্তুতঃ নির্লোভ হওয়ার সাধনাই অপরিগ্রহ সাধন। সকল প্রকার ভোগবিলাসে অনাসক্তিই অপরিগ্রহ সাধনার উৎকৃষ্ট উপায়। ভোগে ত্যাগ ও ত্যাগে ভোগ অর্থাৎ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন। যোগিবর গোরক্ষনাথ বলেন,—

"এক হস্তেধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈক করে স্বয়ম্
অলিপ্ত ত্যাগভোগাভ্যাম্।"

—গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ।

একটি কাহিনীর অবতারণা বোধ হয় এ-স্থলে অসঙ্গত হইবে না।

একদা আলাপণকালে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে পক্ষপাত দোষে দোষী করেন, উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানান যে নিয়মের রাজত্বে তিনি নিরপেক্ষ বিচারক। শ্রীরাধিকা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া যমুনার পরপারে অবস্থিত দুর্বাসা মুনির আশ্রমের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—"তুমি যদি ন্যায় ও নিরপেক্ষ তবে যে মুনি দিবারাত্র

তোমার নাম স্মরণ করিতেছেন সেই দুর্বাসা মুনির জন্য তুমি কি দুইখানি রুটি ও সামান্য ডাল ব্যতীত আর কিছু আহার্যেরই ব্যবস্থা করিতে পার না ?” উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “দিয়া দেখিয়াছি উনি খান না।” শ্রীরাধিকা—“দিলে নাকি খান না ?” শ্রীকৃষ্ণ—“তুমি দিয়া দেখিতে পার, এইতো আমার জন্য ননী-মাখন আনিয়াছ, এগুলিই মুনিকে খাওয়াইয়া আসিতে পার।” কৃষ্ণের জন্য আনীত ননী-মাখন হস্তে লইয়া রাধিকা যমুনার পরপারে আসিতে চাহিলে কৃষ্ণ যমুনার উপর সেতু নির্মাণ করিয়া দিলেন। এদিকে মুনি দুইখানি রুটি ও সামান্য ডাল খাইয়া আহার শেষ করিতে যাইতেছেন এমন সময় শ্রীরাধিকা ননী-মাখন লইয়া উপস্থিত। অনুরোধ ঐগুলি মুনিকে খাইতে হইবে। মহামুনির উত্তর অতি সরল। তিনি বলিলেন,—“তুমি প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দাও, সেইরূপে যদি আমাকেও খাওয়াইয়া দাও তাহা হইলে অবশ্যই খাইব।” অগত্যা শ্রীরাধিকা নিজ হস্তে দুর্বাসা মুনিকে ঐ ননী-মাখন খাওয়াইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লইবেন, মুনি নাকি অন্য কিছুই খান না, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যমুনাতীরে আসিয়া দেখিলেন পূর্বের সেই সেতু আর নাই। তিনি বিষণ্ণ মনে পুনরায় মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া যমুনা পার হইবার উপায় বলিয়া দিতে বলিলেন। মুনি শ্রীরাধিকাকে বলিলেন, —“তুমি যমুনা তীরে গিয়া বল যে যদি আজ দুর্বাসা মুনি দুইখানি রুটি ও সামান্য ডাল ব্যতীত আর কিছুই না খাইয়া থাকেন তবে হে যমুনে আমার পার হইবার জন্য সেতু করিয়া দাও।” বিস্মিতা রাধারাণী মুনির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,— “আমি নিজে আপনাকে ননী-মাখন খাওয়াইলাম, আর আপনি বলিতেছেন যে দুইখানি রুটি আর সামান্য ডাল ব্যতীত কিছুই খান নাই!” মুনির উত্তর—“যমুনা পার হইবার উপায় বলিয়াছি

মাত্র।” অগত্যা শ্রীরাধিকা যমুনা তীরে আসিয়া তাহাই বলিলেন। নদীর উপর সেতু নির্মিত হইয়া গেল; নদী পার হইয়া সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমানা রাধারাণী কৃষ্ণপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ইহাব কারণ জানিতে চাহিলেন। সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে অনাসক্তিই ইহার কারণ। এই নির্লিপ্ততাই অপরিগ্রহ। ইহাই অলিপ্ত ত্যাগভোগাভ্যাম্।

নিয়ম

পূর্বে যোগাঙ্গ ‘যম’ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ ‘নিয়ম’ সম্বন্ধে কিছু বলি। যোগী পতঞ্জলি বলেন—

“শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।”

—পাতঞ্জলদর্শন, সাধান পাদ, ৩২

অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চ প্রকার ক্রিয়া অভ্যাসের নাম ‘নিয়ম’ সাধন।

(ক) শৌচ—যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শৌচ দুই প্রকার যথা—

“শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃ শুদ্ধিস্তথান্তরম্॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

দেহ ও মন এই উভয়েরই শুচিতার প্রয়োজন আছে। এ-দেহ ঈশ্বরের ভোগ-মন্দির—এই জ্ঞান করিয়া অনেকে দেহকে নানা ভাবে পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে চন্দনাদি গন্ধ লেপন করিয়া বাহ্য শুচিতা রক্ষা করিয়া থাকেন। আবার অনেকে দেহের প্রতি উদাসীন থাকেন; তাঁহারা বলেন, নিত্য নিত্য দেহকে পরিষ্কার করিলেও

এ-দেহ যখন পুনরায় দূষিত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে আর পরিষ্কার করার প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ দেহ অপরিচ্ছন্ন থাকিলে নানাবিধ ব্যাধি জন্মাইয়া এ দেহই সাধনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সেই জন্যই বাহ্য দেহের শুচিতার প্রয়োজন। ঈশ্বর চিন্তার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির বিষয়ে সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করেন। সাম্য, মৈত্রী, করুণা, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ অর্জন করিয়া নির্মল চিত্ত হওয়াই শৌচ সাধন। নির্জন-প্রিয়তাই শৌচাচারীর লক্ষণ।

(খ) সন্তোষ—দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই সন্তোষ সাধন। যাহা পাইবার—তাহা অবশ্যই মিলিবে, যাহা প্রাপ্য ছিল—তাহাই পাইয়াছি। সর্বদা মনের এই সন্তুষ্টি রক্ষা করা সন্তোষ সাধন। গীতার শ্লোক দুইটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৮-১৯

এইরূপ জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিই সন্তোষ সাধক।

(গ) তপস্যা—শরীরে তাপ অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করার অভ্যাসকে তপস্যা বলে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি ব্রতোপবাসের দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করাই তপস্যা। ক্ষুধা পাইয়াছে এখনই খাইব না, আরও কিছু সময় ক্ষুধার তাড়না সহ্য করি। তৃষ্ণা লাগিয়াছে—এখনই জলপান করিব না, কিছু সময় বিলম্ব করি। এতাবৎ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আসিতেছি, এখন হইতে কঠিন শয্যায় শুইতে অভ্যাস করি। এইরূপ সাধনই তপস্যা পদবাচ্য। তপস্বী না হইলে যোগে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। "নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।" পরন্তু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে

অষ্টবিধ ঐশ্বর্য লাভ হয়। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য হইতেছে—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, ব্যাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব।

(ঘ) স্বাধ্যায়—প্রণবাদি মন্ত্রজপ এবং মোক্ষবিষয়ক বেদাদি ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করাকে স্বাধ্যায় বলে। স্বাধ্যায়ের ফলস্বরূপ ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

(ঙ) ঈশ্বর প্রণিধান—ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাভাজন হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পরমপদে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। এই ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারাই অতি সত্বর চিত্তের একতানতা সম্পাদিত হয়।

যোগাঙ্গ 'যম' ও 'নিয়ম' এর পাঁচটি করিয়া দশটি উপাঙ্গের বিষয় সংক্ষেপে লিখিলাম। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে যোগসাধনা করি বা না করি আদর্শ চরিত্র গঠন ও সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইলে 'যম' ও 'নিয়ম'-এর অনুশীলন মানব মাত্রেরই করা উচিত। আরও লক্ষ্যণীয় যে যোগসাধনার সঙ্গে ঐগুলির কোন সাক্ষাৎ সম্পর্কও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে নিজেকে যোগসাধনার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য, যোগসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য 'যম' ও 'নিয়ম' সাধনার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়।

'হঠ প্রদীপিকা' নামক যোগশাস্ত্র মতে 'যম' ও 'নিয়ম' দশ দশ প্রকারের। স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র বলেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
দয়ার্জ্জবং মিতাহারঃ শৌচং চৈব যমা দশ॥" ১।১৭ক

"তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানমীশ্বর-পূজনম্।
সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণং হ্রীমতী চ জপোহুতম্॥
নিয়মা দশ সংপ্রোক্তা যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ॥" ১।১৭খ

অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, ক্ষমা, ধৈর্য, দয়া, সরলতা, মিতাহার এবং শৌচ এই দশটি যম।

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজন, সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ এবং হোম এই দশটি নিয়ম। যোগশাস্ত্র বিশারদগণ ইহা বলিয়াছেন।

ষট্‌কর্ম

এক্ষণে ষট্‌কর্ম বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি। পূর্বেই বলিয়াছি যোগসাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হিসাবে যোগিবর গোরক্ষনাথ শরীর শোধনের জন্য ষট্‌কর্ম সাধনার নির্দেশ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে এই ষট্‌কর্ম সাধন হঠ-যোগীদের পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই ষট্‌কর্ম সাধন এতই কষ্টসাধ্য যে সংসারী লোকের পক্ষে ষট্‌কর্ম সাধন একরূপ দুরূহ ব্যাপার। শরীর শোধনের কতকগুলি সহজতর উপায় আছে, সেগুলিও ক্রমান্বয়ে জানাইতেছি। ষট্‌কর্মের প্রথম কর্ম—

১। ধৌতি—ধৌতি প্রধানতঃ চারিপ্রকার। অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদধৌতি ও মূলশোধন।

(ক) অন্তর্ধৌতি আবার চারিপ্রকার। বাতসার, বারিসার, অগ্নিসার ও বহিষ্কৃতি ধৌতি।

বাতসার—জিহ্বা ও অধরোষ্ঠকে কাকের চঞ্চুর ন্যায় করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু পান করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ বায়ুকে উদরে প্রবেশ করাইবেন, পরে উদরের মাংসপেশীকে ক্রমে ক্রমে চালিত করিয়া (Belly muscle control দ্বারা) গুহ্যদেশ দ্বারা ঐ বায়ুকে বাহির করিয়া দিবেন। ইহাই বাতসার। এই বাতসার অভ্যাসের

দ্বারা দেহ নির্মল হয়, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের সমস্ত রোগ ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। যাঁহারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগিতেছেন, তাঁহারা এক মাস প্রত্যহ দুইবার করিয়া এবং প্রতিবারে সাতবার এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য অবশ্যই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

বারিসার—ধীরে ধীরে জলপান করিয়া বাতসারের ন্যায় ঐ জল গুহ্যদেশ দ্বারা বাহির করিয়া দিতে হইবে। এই ক্রীয়াভ্যাসের ফল বাতসারেরই ন্যায়।

অগ্নিসার—নাভিগ্রন্থিকে একশতবার মেরুপৃষ্ঠের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ করিবেন। ইহাই অগ্নিসার। ইহাতে উদর শুদ্ধি ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বহিষ্কৃতি—এই প্রক্রিয়া বাতসারেরই অনুরূপ। কাকী মুদ্রার দ্বারা বায়ু পান করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে এবং পরে উদরস্থ ঐ বায়ুকে অধোবর্ত অর্থাৎ গুহ্যদেশ দ্বারা ঐ বায়ু ত্যাগ করিবেন। একটি কথা আপনারা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, যোগিবর গোরক্ষনাথ উদর হইতে শক্তি নাড়িকে বাহির করিয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় উদরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। মূলতঃ ইহাই বহিষ্কৃতি। উপরোক্ত ক্রিয়াভ্যাসের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা অতীব কঠিন। বিশেষভাবে নিষেধ করিতেছি, গৃহস্থ কোন সাধকই যেন বহিষ্কৃতি ধৌতির অভ্যাস না করেন। বাতসার, বারিসার ও অগ্নিসার অপেক্ষাকৃত সহজ। উহা অভ্যাস করিতে পারেন।

(খ) দন্তধৌতি—দন্তধৌতি পাঁচ প্রকার। দন্তমূলধৌতি, জিহ্বামূল ধৌতি, দক্ষিণ ও বাম কর্ণধৌতি এবং কপাল-রন্ধ্রধৌতি। দন্তমূল ধৌতি—খয়েরের জলদ্বারা অথবা বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল প্রত্যহ তিনবার পরিষ্কার করিবেন।

জিহ্বামূল ধৌতি—তর্জনী মধ্যমা ও অনামা এই অঙ্গুলিত্রয় গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শ্লেষ্মা পরিষ্কার করিবেন, পরে জিভ্‌ছোলা দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করিবেন। ইহাতে জিহ্বা বেশ পাত্‌লা ও দীর্ঘ হইবে। খেচরীমুদ্রা সাধনে জিহ্বাকে পাত্‌লা ও দীর্ঘ করার বিশেষ প্রয়োজন। খেচরী জরামৃত্যু বিনাশ করিয়া থাকে।

কর্ণধৌতি—তর্জনী ও অনামিকা দ্বারা কর্ণরন্ধ্রদ্বয় মার্জনা করিবেন। এই প্রক্রিয়া নাদ শ্রবণের সহায়ক।

কপালরন্ধ্র ধৌতি—উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দিনে তিনবার উভয় কপালের বিবরটিকে মার্জিত করিবেন। ইহা কফ নাশক।

(গ) হৃদ্‌ধৌতি—হৃদ্‌ধৌতি তিন প্রকার। দণ্ডধৌতি, বমন ধৌতি ও বাসধৌতি।

দণ্ডধৌতি—রম্ভা, হরিদ্রা বা বেতের দণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কফ্‌ পিত্তাদি নাশ হইয়া শরীর নীরোগ হয়।

বমনধৌতি—ভোজনের পরে আকণ্ঠ জলপান করিয়া ক্ষণকাল ঊর্ধ্বে দৃষ্টি প্রসারণ করতঃ ঐ জল বমন করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহা কফ্‌-পিত্ত নাশ করে।

বাস্‌ধৌতি—চারি অঙ্গুলি পরিমিত চওড়া বস্ত্রখণ্ড পাকাইয়া গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পরে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। ইহাই বাসধৌতি।

(ঘ) মূলশোধন—গুহ্যদেশ (Rectum) পরিষ্কার করাকে মূলশোধন বলে। ইহা অপান বায়ুর ক্রূরতা নাশ করে।

২। বস্তিঃ—দেহের পশ্চাৎ ভাগকে উত্তান করিয়া অশ্বিনী-মুদ্রার দ্বারা গুহ্যদেশকে কয়েকবার আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হয়। ইহাতে জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আমবাৎ দোষ নষ্ট হয়।

৩। নেতি—একগাছা সূত্র (অধুনা ডাক্তারী সরঞ্জামের দোকানে এক প্রকার সরু রবারের টিউব পাওয়া যায়) নাসিকা বিবর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া মুখ-কুহর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে দিব্য-দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে।

৪। লৌলিকী—ঈষৎ বেগে উদরটি উভয় পার্শ্বে ভ্রমিত করিতে হইবে। (Wavy movement of the belly muscle—umbilical cord). ইহাই লৌলিকীকরণ।

৫। ত্রাটক—কোন একটি সূক্ষ্ম লক্ষ্যে (শালগ্রাম শিলায় অথবা শিবলিঙ্গের নাদবিন্দুতে অথবা দেওয়ালে চোখের তারার ন্যায় একটি কাল বিন্দু চিহ্নিত করিয়া সেই বিন্দুতে) পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিতে অভ্যাস করিবেন। যাবৎ চক্ষু দিয়া জল না পড়ে তাবৎ আসনে স্থির ভাবে ঐরূপ পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিবেন। এই অভ্যাসে যাবতীয় চক্ষুর রোগ উপশম হয় এবং শাম্ভবীমুদ্রায় সত্বর সিদ্ধিলাভ করা যায়। সকলকে বশীকরণ করা যায়।

৬। কপালভাতি—কপালভাতি তিন প্রকার, যথা বাতক্রম, ব্যুৎক্রম ও শীতক্রম।

(ক) বাতক্রম—প্রথমে বাম নাসিকা অর্থাৎ ইড়া বা চন্দ্র নাড়ী দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিয়া কোনরূপ কুম্ভক না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা অর্থাৎ পিঙ্গলা বা সূর্য নাড়ীদ্বারা ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিবেন। এবং পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা বায়ু পুরণ করিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাম নাসিকাদ্বারা রেচন করিবেন। ইহা একবার হইল, এইরূপ একবিংশতিবার করিতে হইবে এবং প্রত্যহ তিনবার এই বাতক্রম-যোগ অভ্যাস করিবেন। ইহা সহজসাধ্য। এই অভ্যাসে এক মাসের মধ্যেই নাড়ী সকল পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

(খ) ব্যুৎক্রম—নাসিকাদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া সেই জল মুখদ্বারা বাহির করিয়া দিবেন এবং পরে মুখদ্বারা জল আকর্ষণ

করিয়া নাসিকাদ্বারা ঐ জল বাহির করিয়া দিবেন। প্রথম প্রথম সামান্য উষ্ণজল লইয়া অভ্যাস করিলে কষ্ট হয় না। এই ব্যুৎক্রম কপালভাতি সামান্য কঠিন হইলেও হানিকর নহে। নিত্য অভ্যাসে ক্রমে সহজ হইয়া আসে। ইহাতে শ্লেষ্মা, কফ ইত্যাদি নষ্ট হইয়া দেহ কান্তিবিশিষ্ট হয়, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে ও শিরঃপীড়া নাশ হয়।

(গ) শীৎক্রম—মুখের দ্বারা শীৎকার করতঃ অর্থাৎ ঠোঁট দুইটি সরু করিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসিকা দ্বারা ঐ বায়ুকে রেচন করিবেন। পুনঃ পুনঃ এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিবেন। ইহাই শীৎক্রম কপালভাতি। ইহাতে কামরিপু প্রশমিত হইয়া বার্দ্ধক্য রোধ হয়।

যোগিবর গোরক্ষনাথ বর্ণিত সপ্ত সাধনের ষট্‌কর্ম সাধন সংক্ষেপে বলিলাম। অবশিষ্ট মুদ্রা-সাধন পরে আলোচনা করিব। তৎপূর্বে আসন-সাধন করিতে হইবে। কারণ প্রতিটি মুদ্রা সাধনে কোন না কোন প্রকার আসনের প্রয়োজন। বস্তুতঃ যোগসাধনে আসন-সাধনই সর্ব প্রথম প্রয়োজন।

আসন-সাধন

যোগাঙ্গ 'যম' ও 'নিয়ম' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি, শরীর শোধনের উপায়স্বরূপ ষট্‌কর্ম সাধনেরও সামান্য আভাস দিয়াছি। এক্ষণে যোগের তৃতীয় অঙ্গ 'আসন' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বস্তুতঃ যোগসাধনায় ইহাই প্রথম ধাপ বা প্রথম সোপান। পূর্বোক্ত যম, নিয়ম ও ষট্‌কর্ম সাধন সাধকের মন ও শরীর গঠনের ভিত্তি স্থাপন মাত্র, অর্থাৎ সাধককে যোগসাধনার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া মাত্র।

আসন সম্বন্ধে যোগী পতঞ্জলি বলেন,—

'স্থিরসুখমাসনম্'—সাধনপাদ-সূত্র, ৪৬।

স্থির হইয়া সুখে উপবেশন করার নাম আসন। বস্তুতঃপক্ষে প্রতিটি আসন সাধনই কষ্টকর। তবে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা উহা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট আসনে যখন অধিক সময় বিনা ক্লেশে বসিয়া থাকিতে পারা যাইবে যাহাতে মেরুদণ্ড সোজা থাকে, শরীর না নড়ে এবং মন বিচলিত না হয়—তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ নির্দিষ্ট আসন সাধনসিদ্ধ হইয়াছে। এক কথায় 'আমি যে কোন আসনে বসিয়া আছি' এরূপ জ্ঞানও যখন মনের মধ্যে উদিত হইবে না, ঐরূপ উপবেশন যখন স্বভাব সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে আসন-সাধন সিদ্ধ হইয়াছে। যোগীগুরু ঘেরণ্ড বলেন,—

"আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্'

'আসন' সাধনার দ্বারা মনের ও দেহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।
আসনের প্রকারভেদ ও সাধনপদ্ধতি,—

পূর্বেই বলিয়াছি যে স্থির হইয়া সুখে উপবেশন করাকেই 'আসন' বলে। সাধক-সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে,—

"ভোজন আমার আহুতি প্রদান, শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর, প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গভঙ্গি মুদ্রা বিরচন, যে ভাবেই বসি সেইতো আসন,
যে চিন্তাই করি, তাঁরই ধ্যান করি, এ জীবন তাঁর যন্ত্র॥"

কথাটা মিথ্যা নয়। কারণ যোগশাস্ত্রে চুরাশি লক্ষ প্রকার আসনের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে চুরাশি প্রকার শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে আবার বত্রিশ প্রকার আসন মানবের বিশেষ শুভদায়ক।

"আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীব জন্তবঃ।
চতুরশীতি লক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা॥
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোনাং শতং কৃতং।
তেষাং মধ্যে মর্ত্তলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্ ॥"

—ঘেরণ্ডসংহিতা, ২।১—২

এই বত্রিশ প্রকার আসন হইতেছে ঃ—

"সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকং।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ॥
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকং।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষং॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনং।
দ্বাত্রিংশদাসনানি তু মর্ত্তলোকে চ সিদ্ধিদম্॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা, ২।৩—৬

'শিবসংহিতা' মতে চারি প্রকার আসন শ্রেষ্ঠ ঃ—

"চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহম্।
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকম্॥

—শিবসংহিতা, ৩।৮৪

চুরাশি প্রকার আসনের মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন প্রধান।

যোগিবর গোরক্ষনাথের মতে সিদ্ধাসন ও পদ্মাসনই প্রধান।

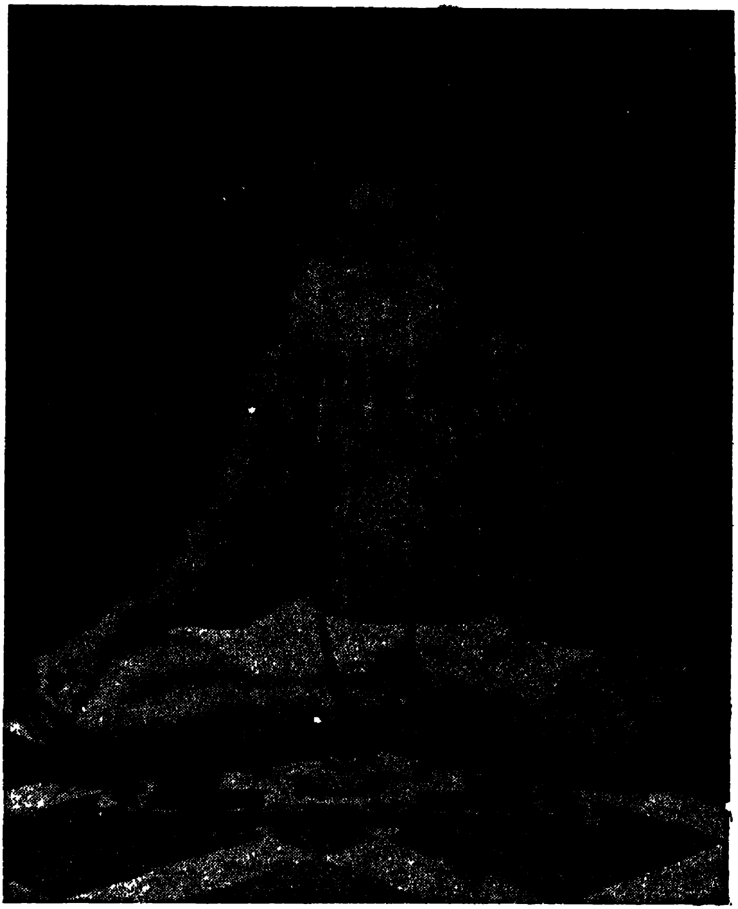
যথা ঃ— আসনেভ্যঃ সমস্তেভ্যোদ্বয়মেতদুদাহৃতং।
একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনং ॥
—গোরক্ষসংহিতা, ১।৮

বহু প্রকার আসন সাধন করিতে করিতে কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে অপরাপর সাধনগুলি সাধনা করিবার সময় কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই, যোগিবর গোরক্ষনাথ সাধক ব্যক্তির জন্য মাত্র দুইটি আসন নির্দেশ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা শরীর গঠন ও ব্যাধি বিমুক্তির জন্য আসনাদি সাধন করিবেন, তাঁহারা প্রয়োজন বোধে বহু প্রকার আসন ও মুদ্রাগুলির অভ্যাস অবশ্যই করিতে পারেন। আসনগুলি চিত্র সহযোগে বর্ণনা করিলে সাধকগণের পক্ষে বুঝিবার ও সাধনা করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু উহা ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় বহু প্রকার আসনের চিত্র প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। সিদ্ধাসন, মুক্ত পদ্মাসন প্রভৃতি কয়েকটি আসন চিত্রে প্রদর্শিত হইল। আসন-সাধকগণ চিত্রগুলি দেখিয়া এবং পদ্ধতিগুলি উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া এই আসনগুলিই যত্ন সহকারে ধৈর্যের সহিত অভ্যাস করিবেন। এই আসনগুলির সাহায্যেই যোগের অন্যান্য অঙ্গগুলি সাধন করা যাইবে।

সিদ্ধাসন—

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা।
ঊর্দ্ধ্বে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥
—শিবসংহিতা, ৩।৮৫

যত্নপূর্বক বাম পাদমূল দ্বারা যোনিপ্রদেশ অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থল পীড়ন করিয়া মেঢ্রোপরি অর্থাৎ তলপেটের নীচে লিঙ্গমূলের



সিদ্ধাসন

উপরে দক্ষিণ পাদমূল অর্থাৎ ডান পায়ের গোড়ালি সংস্থাপন করিবেন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া নিশ্চলচিত্ত হইয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ভ্রূমধ্যদেশমাত্র অবলোকন করিবেন এবং মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অবক্র শরীর হইয়া সমস্ত প্রকার উদ্বেগ রহিত নির্জন-স্থানে এই সিদ্ধাসনের অনুষ্ঠান করিবেন। এই আসনে প্রাণায়ামাদি যোগসাধনে অতি সত্বর সিদ্ধি লাভ করা যায়। সকল প্রকার আসনের মধ্যে সিদ্ধাসনই শ্রেষ্ঠ আসন। যোগিগণের সিদ্ধিদায়ক বলিয়া এই আসনের নাম সিদ্ধাসন।

বদ্ধ পদ্মাসন—

বামোরুপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা।
দক্ষোরুপরি তথৈব বন্ধনবিধিং কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং।
তৎপৃষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে-
দেতদ্ব্যাধি বিকার নাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।১০

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ সংস্থাপিত করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা উভয় পদাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিবেন। তৎপরে হৃদয়দেশে চিবুক সংলগ্ন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করতঃ উপবেশন করিবেন। এই প্রকার সংস্থাপনের নাম বদ্ধ পদ্মাসন। এই পদ্মাসন ব্যাধি ও বিকার নাশকারক, এই আসন সাধনে সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হইলে শরীরে আর ব্যাধি ও বিকার জন্মিতে পারে না। দেহ সুঠাম হয়। এই বদ্ধ পদ্মাসন চঞ্চলমতি বালক বালিকাদের অভ্যাস করাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের মতির পরিবর্তন সাধিত হইয়া তাহারা ধীর, স্থির ও শান্ত স্বভাব হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের মেধা শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। মন স্থির করিবার ইহাপেক্ষা সহজতর উপায় আর নাই।

মুক্ত পদ্মাসন—

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ।
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

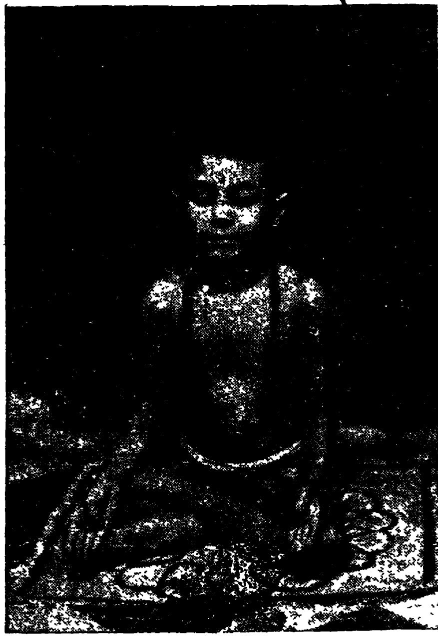
—শিবসংহিতা, ৩।৮৮

বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ পদ ও বাম হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবেন, এবং দক্ষিণ ঊরুর উপরে বাম পদ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবেন। নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংলগ্ন করিবেন এবং চিবুক ও বক্ষস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্তি বায়ু ধীরে ধীরে উদরে পূরণ করতঃ অবিরোধে সাধ্যমত ধারণ করিয়া পশ্চাৎ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধীরে ধীরে যথাশক্তি রেচন অর্থাৎ ত্যাগ করিবেন। ইহাকেই সর্বব্যাধি বিনাশন মুক্ত পদ্মাসন বলে।

এই আসন সিদ্ধাসন হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও বেশ কষ্টকর। এই পদ্মাসনের নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা সাধকের প্রাণায়ামকালে বায়ুর সরল গতি হয়। ইহা সাধককে সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া পরমপদ লাভে সাহায্য করে। এই মুক্ত পদ্মাসন সকল প্রকার আসনের মধ্যে উত্তম। মঙ্গলময় শিব তাই 'পদ্মাসীনং'।

অর্দ্ধ পদ্মাসন--

সকলই মুক্ত পদ্মাসনের ন্যায়, কেবল বাম ঊরুর উপর দক্ষিণ পদ সংস্থাপন করিতে হইবে কিন্তু বাম পদ দক্ষিণ ঊরুর নীচেই থাকিবে। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে সচরাচর বসিয়া থাকি,



পদ্মাসন



বদ্ধ পদ্মাসন

তাহাই অর্দ্ধ পদ্মাসন। তবে মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড সর্বাবস্থাতেই ঋজুভাবে রাখিতে হইবে।

আসনগুলি অভ্যাসকালে আসনের চিত্র একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন।

উগ্রাসন—(অপর নাম পশ্চিমোত্তান আসন)

প্রসার্য্য চণরদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতম্।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরিশিরোন্যসেৎ।
আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিল দীপনম্।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তান সংজ্ঞকম্।
য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিম মার্গেন তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবম্॥

—শিবসংহিতা, ৩।৯২

পদদ্বয়কে প্রসারিত করতঃ পরস্পর অসংযুক্ত রাখিয়া দুই হস্তে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে দৃঢ়রূপে ধরিয়া উভয় জানুর উপর মস্তক



উগ্রাসন বা পশ্চিমোত্তান আসন

সংস্থাপন করিবেন। বায়ুর উদ্দীপক এই আসনের নাম উগ্রাসন। পশ্চাদ্দেশ উত্তান করিয়া অর্থাৎ উপুড় হইয়া এই আসন সাধন

করিতে হয়, তাই ইহার অপর নাম পশ্চিমোত্তানাসন। ইহা দেহের সমস্ত প্রকার অবসাদ হরণ করে। যে সাধক ব্যক্তি এই উগ্রাখ্য আসন শ্রেষ্ঠের প্রত্যহ অনুষ্ঠান করেন তাঁহার পশ্চিম পথ দ্বারা নিশ্চিত বায়ু সঞ্চারিত হয়।

অধিকন্তু এই আসন নিয়মিত অভ্যাসে জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া পেটের যাবতীয় রোগ নষ্ট করে, পশ্চিম নাড়ী সুষুম্না খুলিয়া গিয়া কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে সহায়তা করে, বিন্দুর উর্ধ্বগতি হয়, সকল প্রকার দুর্বলতার নাশ হইয়া যায় এবং মন ও প্রাণের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই উগ্রাসন অভ্যাসে বক্র মেরুদণ্ড সরল ও নমনীয় হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মেরুদণ্ড যত নমনীয় থাকিবে যৌবন ততই দীর্ঘস্থায়ী হইবে। মেরুদণ্ড সরল ও নমনীয় হইলে দেহের স্নায়ুমণ্ডলী ও গ্রন্থিগুলি সক্রিয় থাকিয়া দেহে জরা ও বার্ধক্যের প্রভাব প্রতিরোধ করে, ফলে দেহ আমরণ সবল, সুস্থ ও কার্যক্ষম থাকে। যাহাদের উদরে মেদ বা চর্বি সঞ্চিত হইয়াছে অর্থাৎ ভুঁড়ি বাড়িয়া গিয়াছে, এই আসন অভ্যাসে তাঁহাদের দেহের চর্বি নষ্ট হইয়া দেহ সুন্দর ও সুঠাম হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই আসন অভ্যাস কালে অবশ্যই মনে রখিতে হইবে যে, হাঁটুর নিম্নাংশ অবশ্যই ভূমিসংলগ্ন করিয়া রখিতে হইবে। প্রথম অভ্যাসে মস্তক জানু স্পর্শ নাও করিতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই; ক্রমাভ্যাসে উহা অনায়াসসাধ্য হইয়া যাইবে।

মুদ্রা অভ্যাসের ন্যায় প্রাণায়াম সহযোগেও এই অভ্যাস করা যাইতে পারে। প্রথমে পা ছড়াইয়া সোজা হইয়া বসিবেন, পরে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে দুই হাতে ধরিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মস্তক নত করিয়া জানুর উপর স্থাপন করতঃ শ্বাস রোধ করিয়া কুম্ভক অবস্থায় সাধ্যমত সময় ঐ ভাবে অবস্থান করিবেন। পরে ধীরে

ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে পুনরায় সোজা হইয়া বসিবেন ও পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ছাড়িয়া দিবেন। প্রত্যহ তিনবার—সকাল, বিকাল ও রাত্রে আহারের পূর্বে, প্রতিবারে সাতবার করিয়া এই আসন অভ্যাস করিবেন। আরও একটি কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যখন যে আসন অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবেন তখন সেই আসনই নিয়মিত অভ্যাস করিয়া যাইবেন। একসঙ্গে বহু আসনের অভ্যাস যুক্তিসম্মত নয়। তবে একটি আসন উত্তমরূপে অভ্যাস হইয়া গেলে তখন অন্য আসনের সঙ্গে এই আয়ত্তিকৃত আসন দু-একবার অভ্যাস করিলেই হইবে।

স্বস্তিকাসন—(অপর নাম সুখাসন)

"জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥"

—শিবসংহিতা, ৩।৯৫

জানু ও উরুর মধ্যে সম্যক্ পদতলদ্বয়কে সংস্থাপন করতঃ সমকায় বিশিষ্ট হইয়া সুখে উপবেশন করাকেই স্বস্তিকাসন বলে। পূজকেরা সচরাচর যে আসনে বসিয়া পূজা পাঠ করিয়া থাকেন তাহাই স্বস্তিকাসন। এই আসনে বসিয়াও প্রাণায়াম সাধন করা যায়। স্বস্তিকাসনের চিত্র দেওয়া হইল না।

ভদ্রাসন—

পায়ের গোড়ালীদ্বয় যোনিমণ্ডলের নিকট স্থাপন করিয়া জানুদ্বয় যথাসম্ভব দুই পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া মেরুদণ্ড ও ঘাড় সোজা রাখিয়া উপবেশন করিবেন। হস্তদ্বয়কে হাঁটুর উপর রাখিবেন অথবা উভয় হস্তদ্বারা উভয় পদের অঙ্গুলিগুলি ধারণ করিবেন। পরে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া যথাসম্ভব জালন্ধর বন্ধ সহযোগে ইষ্ট মন্ত্র বা অজপা জপ করিবেন।

এই আসন অভ্যাসে ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হয়, স্ত্রীলোকেরা এই আসনে অভ্যস্ত হইলে সন্তান প্রসবের সময় তাঁহাদের কষ্ট পাইতে হয় না।

ভদ্রাসনের প্রকারান্তর।

যোগিগুরু ঘেরণ্ড বলেন—

গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বা চ পৃষ্ঠদেশতঃ॥
জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধি বিনাশকম্॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা ২, ১১-১২

গুল্‌ফদ্বয় সিবনী অর্থাৎ কোষের নিম্নে বিপরীতভাবে বিন্যস্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া করদ্বয় প্রসারিত করতঃ চরণদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় ধারণ পূর্বক জালন্ধর বন্ধ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিয়া উপবেশন করিবেন। ইহাকেই ভদ্রাসন কহে। এই আসন অভ্যাস করিলে সর্ব রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এখন জালন্ধর বন্ধ কি তাহাই বলিতেছি—

কণ্ঠ সংকোচনং কৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে ন্যসেৎ।
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধার বন্ধনং।
জালন্ধরং মহামুদ্রা মৃত্যোশ্চ ক্ষয়কারিণী॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩।১২

কণ্ঠদেশ সংকোচন পূর্বক হৃদয়ে চিবুক সংন্যস্ত করিলেই তাহাকে জালন্ধর বন্ধন বলা যায়।

প্রথম প্রকার ভদ্রাসনের চিত্র দেওয়া হইল। দ্বিতীয় প্রকার ভদ্রাসন অপেক্ষাকৃত কঠিন হওয়ায় তাহা চিত্র সহযোগে দেখান



ভদ্রাসন

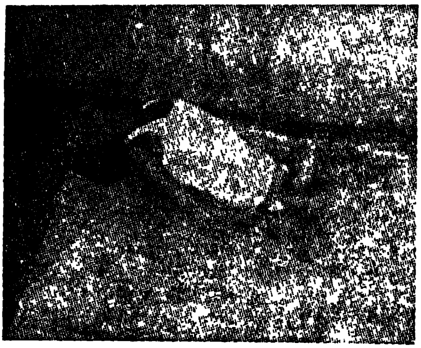


উত্থিত পদ্মাসন

সম্ভব হইল না। চিত্রের সামান্য ক্রটিবিচ্যুতি আসন-সাধকগণ মূল পাঠ দেখিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

মৎস্যাসন—

প্রথমে মুক্ত পদ্মাসনে সোজা হইয়া বসিবেন। পরে ধীরে ধীরে চিৎ হইয়া শুইবেন এবং কনুইদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া ঘাড় ও পৃষ্ঠের উপরিদেশ ভূমি হইতে সাধ্যমত উত্তোলন করিবেন এবং দুই হস্তদ্বারা দুইপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে ধারণ করিবেন। অর্থাৎ বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবেন। ইহাতে উদর ও বক্ষস্থল উর্ধ্বে উত্তোলিত হইবে এবং ব্রহ্মতালু মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে। দৃষ্টি ভ্রুযুগলের মধ্যে নিবদ্ধ



মৎস্যাসন

রাখিয়া ইষ্ট চিন্তা করিবেন। দুই হইতে পাঁচ মিনিট কাল এই আসন অভ্যাস করিবেন। বালকদেরও শিখাইবেন।

এই আসন অভ্যাস করিলে ধীশক্তি বৃদ্ধি হয়, অজীর্ণ, পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদযন্ত্র বড় ও মজবুত হয়। দেহের কর্মশক্তি ও মনের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রাণায়াম-সাধন

প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে কয়েকটি মুদ্রা সাধনের দ্বারা নাড়ী শুদ্ধি করিয়া লইতে হয়; নচেৎ বায়ুর বেগ ধারণ করার ক্ষমতা জন্মে না। কিন্তু মুদ্রা-সাধন প্রক্রিয়াগুলি আবার প্রাণায়ামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় একটির কথা বলিতে গেলে অপরটি আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ নাড়ী শুদ্ধির প্রক্রিয়া বা মুদ্রা-সাধন প্রাণায়ামেরই অন্তর্গত। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে এই দুইটিকে স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে গণ্য না করিয়া কেবল প্রাণায়ামকেই যোগাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি প্রাণায়ামের সূত্র ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছি।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইতে হইলে বায়ু সম্বন্ধে— বিশেষ করিয়া প্রাণবায়ু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে একই বায়ু তাহার বিভিন্ন কার্য ভেদে ঊনপঞ্চাশদ্ নাম ধারণ করে। তাই আমরা বলিয়া থাকি বায়ু ঊনপঞ্চাশ প্রকার। জীবদেহে এই বায়ুই প্রাণস্বরূপ। এক প্রাণ বায়ুই জীবদেহে তাহার বিভিন্ন বৃত্তিভেদে দশনামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ।
নাগঃ কূর্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥

—শিবসংহিতা, ৩।৪

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি অন্তর্বায়ু এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটি বহির্বায়ু। দেহস্থ এই দশ বায়ুর মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চ বায়ু প্রধান, তাহাদের মধ্যে

আবার প্রাণ ও অপান বায়ুই মুখ্য। জীবদেহে ইহাদের অবস্থান হইতেছে—

হৃদিপ্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুহ্যমণ্ডলে,
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ;
ব্যানো ব্যাপী শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।২৯-৩০

হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠে উদান এবং ব্যান বায়ু সর্বশরীরে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে।

দশবায়ুর কার্য সম্বন্ধে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্।
অপানবায়োঃ কর্ম্মৈতদ্বিন্মূত্রাদিবিসর্জ্জনম্॥
হানোপাদানচেষ্টাদির্ব্যানকর্ম্মেতি চেষ্যতে।
উদানকর্ম্ম তচ্চোক্তং দেহস্যোন্নয়নাদি যৎ॥
পোষণাদি সমানস্য শরীরে কর্ম্ম কীর্ত্তিতং।
উদ্গারাদিগুর্ণো যস্ত নাগকর্ম্ম সমীরিতং॥
নিমীলনাদি কূর্ম্মস্য ক্ষুত্তৃষ্ণে কৃকরস্য চ।
দেবদত্তস্য বিপ্রেন্দ্র তন্দ্রাকর্ম্মেতি কীর্ত্তিতং।
ধনঞ্জয়স্য শোষাদি সর্ব্বকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৪।৬৬-৬৯

হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করাই প্রাণবায়ুর প্রধান কার্য। ইহা ব্যতীত ভুক্ত আহার্য ও পানীয়কে পাকস্থলিতে পরিপাক করিয়া পৃথকীকরণও প্রাণবায়ুর আর একটি কার্য, ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করিবার জন্য উদরে অগ্নি প্রজ্বালন করা, মলমূত্র ও রসাদি বস্তুকে তাহাদের স্ব স্ব পথে চালিত করা অপান বায়ুর কার্য; চক্ষু, কর্ণ, গুল্‌ফ, গলদেশ, কটীদেশ ও হস্তপদাদি

সর্ব শরীরের কার্য সম্পাদন ব্যান বায়ুর কার্য। দেহের উন্নয়ন সাধন করাই উদান বায়ুর কার্য। পরিপক্ক রসাদিকে শরীরস্থ বাহাত্তর হাজার নাড়ীমধ্যে পরিব্যাপ্ত করতঃ দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বেদাদি অসার বস্তুকে নিঃসারণ করা সমান বায়ুর কার্য। উদ্‌গারাদি ক্রিয়া নাগবায়ুর কার্য, সঙ্কোচন প্রসারণাদি ক্রিয়া কূর্মবায়ুর কার্য, ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অনুভূতি সম্পাদন কৃকর বায়ুর কার্য। নিদ্রাতন্দ্রাদির অনুভূতি দেবদত্ত বায়ুর কার্য, এবং হিক্কা শোষণাদি ক্রিয়া ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য। বস্তুতঃ জীবদেহে বায়ুর কার্য এত ব্যাপক যে বায়ুবিজয় সম্বন্ধে শিবমুখ নিঃসৃত পবনবিজয় স্বরোদয় শাস্ত্র নামে একখানি স্বতন্ত্র যোগশাস্ত্রই রচিত হইয়াছে। বায়ুর এই সকল গুণ ও কার্য অবগত হইয়া বায়ুকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিলে সর্বব্যাধি বিনির্মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারা যায়, এবং দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডকে জানিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দেহান্তে পরম গতি লাভ সাধক ব্যক্তির করতলগত হয়। অর্থাৎ মুক্তি সাধকের ইচ্ছার অধীন হইয়া থাকে—সাধক তখন জীবন্মুক্ত। বায়ুবিজয় সম্বন্ধে শিবসংহিতায় বলা হইয়াছে—

> অনেন বিধিনা যো বৈ ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহম্।
> সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥
>
> —শিবসংহিতা, ৩৷৯

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির প্রতি মিনিটে পনের বার হিসাবে এক অহোরাত্রে (১৫ × ৬০ × ২৪) = ২১৬০০ বার শ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহস্থ বায়ুকে স্ববশে আনয়ন করিয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার লাভের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই প্রাণায়াম নামে অভিহিত।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।
—পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ৪৯

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির বিচ্ছেদ সাধনই প্রাণায়াম।

শ্বাস কি ? না—

(সত্যাসন জয়ে) বাহ্যস্থ বায়োরাচমনং শ্বাসঃ।

অর্থাৎ বাহিরের বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া শরীর মধ্যে গ্রহণ করার নাম শ্বাস।

প্রশ্বাস কি ? না—

কোষ্ঠস্থ বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ।

অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ুকে বাহিরে নির্গত করিয়া দেওয়াই প্রশ্বাস।

প্রাণায়াম কি ? না—

তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ।

অর্থাৎ যে অবস্থায় শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতির বিচ্ছেদ অর্থাৎ এতদুভয়ের যে অবস্থায় অভাব তাহাই প্রাণায়াম। সাধারণভাবে বলা হয় প্রাণায়ামের তিন অবস্থা।

প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচক পূরক কুম্ভকৈঃ॥
—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।২

প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ সাধন প্রাণায়াম রূপ যোগ। এবং রেচক পূরক ও কুম্ভক ইহাও প্রাণায়াম। শরীরস্থ বায়ুকে বাহিরে আনয়ন করাই রেচক, বহিস্থ বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করাই পূরক এবং কুম্ভমধ্যে জলরাশিকে সঞ্চিত করিয়া রাখার ন্যায় দেহ মধ্যে স্থান বিশেষে এবং দেহের বাহিরে বায়ুকে বিধৃত করিয়া বা রোধ করিয়া রাখার নাম কুম্ভক। পাতঞ্জল

দর্শনের ভাষ্য মতে প্রকৃতপক্ষে কুম্ভকই প্রাণায়াম। তবে পূরক ও রেচক যথাক্রমে শ্বাস ও প্রশ্বাসের নামান্তর হইলেও উহা যোগশাস্ত্র বিধিমতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া পূরক ও রেচকও প্রাণায়ামের অন্তর্গত।

বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভ এই বৃত্তিভেদে প্রাণায়াম (কুম্ভক) আবার তিন প্রকার। দেশ, কাল ও সংখ্যা অর্থাৎ শরীরের স্থান, সময় এবং মন্ত্রাদির সংখ্যা জপের দ্বারা প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম দুই নামে অভিহিত। সাধারণ ভাষায় প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু এবং আয়াম শব্দের অর্থ নিরোধ। প্রাণায়াম অর্থে প্রাণবায়ুর নিরোধ।

বাহ্যবৃত্তি—বায়ুকে রেচন করিয়া আর পূরণ না করা অর্থাৎ প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার পর পুনরায় গ্রহণ না করিয়া বায়ুকে বাহিরে রোধ করিয়া সাধ্যমত কুম্ভক করাই প্রাণায়ামের বাহ্যবৃত্তি।

অভ্যন্তর বৃত্তি—বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে পূরণ করিয়া আর ত্যাগ না করা অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করিবার পর ঐ প্রপূরিত বায়ুকে দেহ মধ্যে স্থান বিশেষে সাধ্যমত অবরুদ্ধ রাখিয়া যে কুম্ভক তাহাই প্রাণায়ামের অভ্যন্তর বৃত্তি।

স্তম্ভবৃত্তি—প্রাণায়ামের স্তম্ভবৃত্তির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। নাসিকা পথে প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকিলে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ স্ফীত হইতে থাকে। ফলে অপান বায়ুও প্রাণ বায়ুর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যোনিদেশ হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া নাভিমণ্ডলের নিম্নদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। রেচক কালে প্রাণবায়ুর বহির্গতি হইতে থাকিলে নাভিমণ্ডল ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তখন অপান বায়ু পুনরায় স্বস্থানে যোনিদেশে নামিয়া যায়। প্রাণ ও অপান বায়ুর এইরূপ আকর্ষণ ও বিকর্ষণে দেহ জীবিত থাকে। মৃত্যুকালে অপান বায়ু নাভিমণ্ডল অর্থাৎ সমান বায়ুকে ভেদ

করিয়া প্রাণ বায়ুর. সহিত মিলিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। তখন অপান বায়ু আর প্রাণ বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিতে পারে না, ফলে প্রাণ বায়ুও আর শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায় জীবের মৃত্যু হয়। অপান বায়ু যখন নাভিমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বগতি হইয়া প্রাণ বায়ুর সহিত মিলিত হইতে থাকে তখন জীবের যে শ্বাসকষ্ট দেখা যায় তাহাকেই নাভিশ্বাস বলে।

"অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।"

—ষট্‌চক্রভেদ টীকা।

অপান প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপান বায়ুকে আকর্ষণ করে, এই কথাটিই সবিশেষ মনে রাখিতে হইবে।

শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি হইতেছে,—

"প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তো নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলম্।"

অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণের সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত বায়ু হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের সময় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত বায়ু নাসা পথে বাহির হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ভোজন, শয়ন, গমন, রতিক্রিয়া প্রভৃতি কার্য বিশেষে শ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর গতি স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যায়। স্বরোদয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিদশাঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতৌ মূলে পরমায়ু প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্‌গতে॥

আবার নিয়মিত সাধনাভ্যাসের দ্বারা ঐ স্বাভাবিক দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত নির্গত বায়ুর গতি হ্রাস করা যায়। এই গতি যতই হ্রাস করিতে পারা যাইবে ততই যোগবিভূতি লাভ হইবে। শরীর নিরোগ হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ হইবে, লাভ হইবে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব। পবনবিজয় স্বরোদয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

“একাঙ্গুলকৃতন্ন্যনে ত্রাণে নিষ্ক্রামতি মতা।
আনন্দস্তু দ্বিতীয়ে স্যাৎ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে ॥
বাচঃ সিদ্ধিশ্চতুর্থে তু দূরদৃষ্টিস্তু পঞ্চমে।
ষষ্ঠে ত্বাকাশ গমনং চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে ॥
অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধয়ো নব।
দশমে দশমূর্ত্তিশ্চ ছায়ানাশো দশৈককে ॥
দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামৃতরসং পিবেৎ।
আনখাগ্রে প্রাণপুর্ণে কস্য ভক্ষাঞ্চ ভোজনম্ ॥”

ক্রমে ক্রমে সাধনার উচ্চাবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে প্রাণ বায়ু একেবারে গতিহীন হইয়া নিরোধ হইয়া যায়। অর্থাৎ বায়ু স্তম্ভিত হইয়া যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাহিরের বায়ু ও শরীরস্থ বায়ু ক্রমে গতিহীন হইয়া সমচাপসম্পন্ন হইয়া যায়। তখন হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া আসে। এ অবস্থায় কোনরূপ কার্য না হওয়ায় এমন কি হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনজনিত শরীরের কোনরূপ ক্ষয়ও না হওয়ায় শরীর রক্ষার জন্য অক্সিজেন বায়ুরও প্রয়োজন হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা যে সে অবস্থায় থাকে না বা আহারাদির প্রয়োজনও যে সে অবস্থায় হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। বায়ু শরীরাভ্যন্তরে আপাদমস্তক পরিব্যাপ্ত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করে। এ-অবস্থালব্ধ যোগী তখন অনায়াসে মৃত্তিকাগর্ভে বা জলমধ্যে দীর্ঘদিন কুম্ভক করিয়া

অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহাতে যোগীর মৃত্যু হয় না। তিনি তখন পূর্ণ জ্ঞানানন্দে নিমগ্ন থাকেন। প্রাণের এই স্তম্ভিত ভাবই প্রাণায়ামের স্তম্ভবৃত্তি। প্রসঙ্গক্রমে সেকশুভোদোয়ার একটি কাহিনীর উল্লেখ বোধ হয় এস্থলে অবান্তর হইবে না।

নৃপতি বল্লালপুত্র রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে রাজার মাহুত একটি হাতীকে লইয়া মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। হাতীটির চলার পথে একটি মাটির ঢিপি পড়ে, মাহুত হাতীটিকে ঐ ঢিপির উপর দিয়াই লইয়া যাইতে চাহিলে হাতীটি তাহার উপর দিয়া না গিয়া শুঁড় দিয়া ঢিপিটিকে বারংবার প্রণাম জানাইয়া ঢিপির পাশ দিয়া চলিয়া যায়। ইহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত মাহুত রাজা লক্ষ্মণসেনকে ঘটনাটি নিবেদন করে। রাজা লোক দিয়া সন্তর্পণে ঐ ঢিপিটি খনন করাইলে এক সমাধিমগ্ন যোগীকে দেখিতে পান। সমাধি ভঙ্গ হইলে যোগী বলেন, "দেশের রাজা কে?" রাজার লোকজন বলে দেশের রাজা লক্ষ্মণসেন। তদুত্তরে যোগী বলেন, "রাজা বিক্রমজিত গেলেন-কোথায়?" ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে ঐ যোগীব্যক্তি রাজা বিক্রমজিতের রাজত্বকালে ভূগর্ভে যে জীবন্ত সমাধি লইয়াছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তাহা ভঙ্গ করেন। এই দুই রাজার রাজত্বকালের ব্যবধান কত বৎসর তাহা ঐতিহাসিকগণকে নিরূপণ করিতে অনুরোধ জানাই। রাজা লক্ষ্মণসেন ঐ যোগীকে সসম্মানে রাজধানীতে লইয়া গিয়া পরিচয় লইয়া জানিতে পারেন যে তিনি একজন সিদ্ধ নাথযোগী; নাম চন্দ্রনাথ। প্রাণায়ামের স্তম্ভবৃত্তি যোগীকে কত বৎসর ঐ একই ভাবে স্তম্ভিত রাখিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাণায়ামের প্রকার ভেদ

প্রাণায়াম আট প্রকার, যথা—

"সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ॥"

—গোরক্ষ সংহিতা, ১।১৯৫

যোগাচার্য গোরক্ষনাথের মতে সহিত, সূর্যভেদ, উজ্জায়ী শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী এই আট প্রকার প্রণায়াম। কোন কোন যোগশাস্ত্র মতে সহিত প্রাণায়ামের নামান্তর উড্ডিয়ান, উজ্জায়ী প্রাণায়ামের নামান্তর শীৎকার এবং কেবলী প্রাণায়ামের নামান্তর প্লাবনী প্রাণায়াম। 'হঠ প্রদীপিকা' নামক যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ—

"নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভঃ কেবলোপমঃ।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদসদৃশোলয়ঃ॥" ১।৪৪

অর্থাৎ সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই, কেবলী প্রাণায়ামের তুল্য কুম্ভক নাই, খেচরী মুদ্রার সমান মুদ্রা নাই এবং নাদ-সাধন সদৃশ লয়যোগ সাধন নাই।

সহিত বা উড্ডিয়ান প্রাণায়াম

সহিত প্রাণায়াম দুই প্রকার। যথা—

"সহিতো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়মং সমাচরেৎ
সগর্ভো বীজমুচ্চার্য্য নির্গর্ভো বীজ বর্জ্জিতঃ॥"

—গোরক্ষ সংহিতা, ১।১৯৬

এই দুই প্রকার 'সহিত' কুম্ভক হইতেছে—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যে প্রাণায়াম করা যায় তাহা সবীজ বা সগর্ভ এবং কোনরূপ বীজমন্ত্র জপ না করিয়া কুম্ভকরূপ যে প্রাণায়াম তাহা নির্বীজ বা নির্গর্ভ প্রাণায়াম।

'যোগী যাজ্ঞবল্ক্য', নামক যোগশাস্ত্র মতে 'সহিত' প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইতেছে—

ইড়য়া বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতং।
শনৈঃ ষোড়শভির্মাত্রৈরকারং তত্র সংস্মরেৎ॥
ধারয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুঃষষ্ঠ্যা চ মাত্রয়া।
উকার মূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরন্ প্রণবং জপেৎ॥
যাবদ্বা শক্যতে তাবৎ ধারণং জপ সংযুতং।
পূরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্বিতং॥
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গি দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া পুনঃ।
প্রাণায়ামো ভবেদেবং পুনশ্চৈবং সমভ্যসেৎ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।৪-৭

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় স্ত্রী গার্গীদেবীকে এই যোগোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

'রাজমার্ত্তণ্ড' মতে 'সহিত' প্রাণায়াম হইতেছে—

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বায়ু ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্তস্তত্তুরীয়তঃ॥
তদশক্তৌ চ চতুর্থ্যাং এবং প্রাণস্য সংযম।
প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূজনেনৈতি যোগ্যতাম্॥
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুট ধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমাং বিনা॥

প্রাণায়ামপরায়ণ না হইলে পূজায় অধিকার জন্মে না। বস্তুতঃপক্ষে আমরা যে দেবদেবীর পূজা করি তাহাও এক প্রকার যোগ। দেবতা ও পূজকের মধ্যে সংযোগ সাধিত না হইলে পূজা বৃথা হইয়া যায়।

যোগীপ্রবর গোরক্ষনাথ সবীজ সহিত প্রাণায়াম বিষয়ে বলিতেছেন,—

প্রাণায়ামং সগর্ভ চ প্রথমং কথয়ামি চ।
সুখাসনে চোপবিশ্য প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ॥
ধ্যায়েদ্বিধিং রজোগুণং রক্তবর্ণমবর্ণকং।
এবং ধ্যানেন ক্রমশশ্চিত্তস্থৈর্য্যং প্রজায়তে॥
ইড়য়া পুরয়েদ্বায়ুং মাত্রয়া ষোড়শৈঃ সুধীঃ।
পুরাকান্তে কুম্ভকাদ্যে কর্ত্তব্যং উড্ডীয়ানকং॥
সত্ত্বময়ং হরিং ধ্যাত্বা উকারং কৃষ্ণ বর্ণকং।
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ কুম্ভকেনৈব ধায়য়েৎ॥
তমোময়ং শিবং ধ্যাত্বা মকারং শুক্লবর্ণকং।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া চৈব রেচয়েদ্বিধিনা পুনঃ॥
পুনঃ পিঙ্গলয়াপুর্য্য কুম্ভকেনৈব ধারয়েৎ।
ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ তদ্বিজেন ক্রমেনতু॥
অনুলোমবিলোমেন কুম্ভকান্তং ধৃত নাসাপুটদ্বয়ং।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈস্তর্জ্জনী মধ্যমাং বিনা।
এবং ক্রমেন কুর্ব্বীত প্রাণায়াম সমাভ্যাসং॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।১৯৭-২০৩

'সহিত' প্রাণায়াম সাধন সম্পর্কে সার কথা হইতেছে যে, অভ্যাসীকৃত আসনে পূর্ব বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া সুখে উপবেশন করতঃ প্রথমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া ইড়ানাড়ী (চন্দ্রনাড়ী) অর্থাৎ বাম নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদরে চালিত করিতে করিতে রজোগুণ সম্পন্ন রক্তবর্ণ ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়া তৎ প্রতিপাদক 'অ' এই বীজ মন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে হইবে। পরে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুটও বন্ধ করিয়া সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া তৎ প্রতিপাদক

'উ' এই বীজমন্ত্র চৌষট্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে। পরে দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঠাইয়া লইয়া পিঙ্গলা নাড়ী (সূর্য নাড়ী) অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে তমোগুণ সম্পন্ন শুক্লবর্ণ মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তৎ প্রতিপাদক 'ম' এই বীজমন্ত্র বত্রিশবার জপ করিতে হইবে। পশ্চাৎ বিপরীত ক্রমে পূর্বের মত দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা পূরক পরে উভয় নাসাপুট বন্ধ করিয়া কুম্ভক ও পরে বাম নাসায় রেচক করিতে হইবে। এই সমস্ত ক্রিয়াটি অর্থাৎ বাম নাসায় পূরক পরে কুম্ভক ও শেষে দক্ষিণ নাসায় রেচক এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ নাসায় পূরক পরে কুম্ভক ও শেষে বাম নাসায় রেচক করিলে একবার মাত্র 'সহিত' প্রাণায়াম হয়। একাসনে এইরূপ সাত বা একবিংশতি বার প্রাণায়াম এবং দিবারাত্রে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ অনুষ্ঠান করা বিধেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে আহারের পরেই ভরা পেটে কুম্ভক করা উচিত নয়।

কোন কোন যোগ শাস্ত্রে 'সহিত' প্রণায়ামে পূরকের পর এবং কুম্ভকের পূর্বে উড্ডিয়ান মুদ্রা করিবার বিধি আছে। সম্ভবতঃ সেইজন্য সহিত প্রাণায়ামের অপর নাম উড্ডাখ্য বা উড্ডীয়ান প্রাণায়াম। এখন উড্ডীয়ান মুদ্রা কি তাহাই বলি।

উদয়াৎ পশ্চিমে ভাগে অধোনাভের্নিগদ্যতে।
উড্ডীনং কুরুতে যস্মাদবিশ্রান্তো মহাখগঃ।
উড্ডীয়ানং তদেব স্যান্মৃত্যু মাতঙ্গ কেশরী॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৫৯

অর্থাৎ নাভির অধোভাগ হইতে জীবরূপ পক্ষী মহাখগ অবিশ্রান্ত ভাবে উড্ডীন করিতেছে, সেই নাভির অধোদেশকে উদরের পশ্চিম ভাগে পৃষ্ঠে সংযোজিত করিতে হইবে। ইহাকেই উড্ডীয়ান মুদ্রা বলে।

এই মুদ্রা মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের দমনকারী কেশরী স্বরূপ। এই মুদ্রা সম্যক্ অভ্যাস করিতে পারিলে আর মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না।

তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানটি এইরূপ হইবে। প্রথমে বাম নাসায় পূরক করিয়া পরে নাভির অধোভাগ আকুঞ্চিত করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে ও শেষে রেচক করিবার কালে নাভির অধোভাগ আবার স্ফীত হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ নাসায় পুনরায় পূরক করিয়া আবার উড্ডীয়ান মুদ্রা, তৎপর কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে।

এখন নির্বীজ 'সহিত' প্রাণায়ামের কথা বলি।

প্রাণায়াম নির্গর্ভস্তু বিনা বীজেন জায়তে।
একাদি শত পর্য্যন্তং পূরকুম্ভক রেচনং ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।২০৪

এই নির্গর্ভ প্রাণায়াম বিনা বীজে করিতে হয়, অর্থাৎ কোন রূপ বীজমন্ত্র জপ করিতে হয় না। পূরক, কুম্ভক ও রেচক তিনটি অনুষ্ঠানই করিতে হয়, কেবল সাধ্যমত সময় কুম্ভক করিতে হইবে। সাধককে মনে রাখিতে হইবে যে যত ধীরে শ্বাস গ্রহণ করা হইবে তাহা অপেক্ষা অধিক ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে।

'সহিত' প্রাণায়াম সাধনের ফল স্বরূপ যোগাচার্য বলেন,—

প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাৎ রোগক্ষয়ঃ।
প্রাণায়ামাৎ শক্তি বোধঃ প্রাণায়ামান্ মনস্বিতা ॥
আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামেণ নিশ্চয়।
অতঃ সর্ব প্রকারেণ প্রণায়ামী সুখী ভবেৎ ॥

—গোরক্ষ সংহিতা, ১।২০৫-২০৬

এই সহিত প্রাণায়াম সাধনে চিত্তের স্থৈর্য লাভ হয়॥ নিয়মিত অভ্যাসে দেহ লঘু হইয়া খেচর গতি লাভ হইতে পারে। শ্লেষ্মা, জলোদরী গণ্ডদোষ প্রভৃতি ব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া আত্মশক্তির

উন্মেষ হয় এবং প্রাণায়ামের দ্বারা মনস্বিতা বৃদ্ধি পায়। চিত্তের আনন্দ বর্দ্ধক এই প্রাণামের দ্বারা সাধক ব্যক্তি সুখী হয়েন।

নাড়ীশুদ্ধি না হইলে বায়ুর বেগ ধারণ করা যায় না। সেই জন্য নাড়ীশুদ্ধির সহজতম উপায়টি বলিতেছি। ইহা কুম্ভকহীন প্রাণায়াম মাত্র। অনুষ্ঠানটি এইরূপ—আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপথ রোধ করিয়া বাম নাসাপথে উদরে যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিতে হইবে। পরে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপথ রোধ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাসাপথে যথাশক্তি বায়ু রেচন করিতে হইবে। রেচকান্তে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ নাসাপথে পূরক করিয়া পূরকান্তে সঙ্গে সঙ্গে বাম নাসাপথে রেচক করিতে হইবে। ইহাই একবার মাত্র প্রাণায়াম হইল। একাসনে অবিরাম এইরূপ একবিংশতিবার এবং দিবারাত্রে তিন চারবার এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে এক মাসের মধ্যেই নাড়ী বিশুদ্ধ হইয়া বায়ুর বেগ ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এই অনুষ্ঠানকে কপালভাতিও বলে।

প্রণবকে (অ-উ-ম) বিভাগ করিয়া যথাক্রমে পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবার বিধি যোগশাস্ত্রে লিখিত হইলেও অনেক যোগবিদ্ গুরু পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন অবস্থাতেই একই বীজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রণবটি ওঁ জপ করিবার নির্দেশ প্রধান করেন। 'সোঽহং', মায়াবীজ হ্রীঁ বা অন্য দেবদেবীর বীজমন্ত্র অথবা সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রও জপ করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে পূরক কুম্ভক ও রেচক যথাক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার জপ করা সম্ভব না হইলে ৮।৩২।১৬ অথবা ৪।১৬।৮ বার জপ করিলেই হইবে। যাঁহারা কেবল সমগ্র সাবিত্রী গায়ত্রী বা ব্রহ্ম গায়ত্রী জপের দ্বারা সহিত প্রাণায়াম সাধন করিতে অভ্যাস করিবেন তাঁহারা পূরকে একবার, কুম্ভককে চারবার এবং রেচকে দুইবার করিয়া জপ করিবেন।

সূর্যভেদ প্রাণায়াম—

যোগাচার্য গোরক্ষনাথ বলেন,—

পূরয়েৎ সূর্য্যনাড্যা চ যথাশক্তি বহির্ম্মরুৎ।
ধারয়েদ্ বহু যত্নেন কুম্ভকেন জলন্ধরৈঃ।
যাবৎ স্বেদং ন কেশাগ্রাৎ তাবৎ কুর্ব্বন্তু কুম্ভকম্॥

—গোরক্ষসংহিত, ১।২০৭-২০৮

সূর্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা যথাশক্তি বহিঃস্থ বায়ুকে অভ্যন্তরে পূরণ করিতে হইবে, তৎপরে জালন্ধর মুদ্রা সহযোগে যত্ন পূর্বক কুম্ভকের দ্বারা ঐ আকৃষ্ট বায়ুকে ধারণ করিয়া যে পর্যন্ত কেশের অগ্রভাগ হইতে ঘর্ম বহির্গত না হয়, সে পর্যন্ত কুম্ভক করিয়া থাকিতে হইবে।

সর্ব্বে তে সূর্য্য সংভিন্না নাভিমূলাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্যেণাখণ্ড বেগতঃ॥
পুনঃ সূর্য্যেণ চাকৃষ্য কুম্ভয়িত্বা যথাবিধি।
রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।২০৯-১০

অতঃপর সূর্যনাড়ী বা পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা সংভিন্ন সমস্ত বায়ুকে নাভিমূল হইতে উত্তোলিত করিয়া অতি ধৈর্যের সহিত ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকাদ্বারা ঐ বায়ুকে অতিশয় বেগে রেচন করিতে হইবে। পুনরায় সূর্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া যথারীতি জালন্ধর বন্ধপূর্বক কুম্ভক করিয়া বাম নাসাপথে ঐ বায়ুকে রেচন করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে হয়।

সূর্যভেদ প্রাণায়ামের ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে যোগাচার্য বলেন,—

কুম্ভকং সূর্যভেদস্তু জরা মৃত্যু বিনাশকঃ।
বোধয়েৎ কুণ্ডলীং শক্তিং দেহানল বিবর্দ্ধয়েৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।২১১

সূর্যভেদ নামক এই কুম্ভক জরা ও মৃত্যু বিনাশকারী। ইহার ক্রমশিক্ষায় কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জানিতে পারা যায় এবং এই কুম্ভক জঠরাগ্নি সন্দীপিত করতঃ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উদরের সমস্ত রোগ বিনষ্ট করিয়া দেহানল বর্ধিত করে।

রাজযোগী দত্তাত্রেয় বলেন,—

অভ্যাসেদ্ যস্তু সত্বরো বৃদ্ধোপি তরুণায়তে।
ষণ্মাসমভ্যাসান্মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

—দত্তাত্রেয় সংহিতা

এই প্রাণায়ামের অভ্যাসে বৃদ্ধ ব্যক্তিও অতি সত্বর তারুণ্য প্রাপ্ত হন এবং ছয় মাস নিয়মিত অভ্যাসে মৃত্যুকে জয় করা যায়।

এখন জালন্ধর বন্ধ বা জালন্ধর মুদ্রা কি এবং কিরূপেই বা সাধন করিতে হয় তাহাই বলি।

যোগীগুরু ঘেরণ্ড বলেন,—

কণ্ঠ সংকোচনং কৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে ন্যসেৎ।
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধার বন্ধনং।
জালন্ধরং মহামুদ্রা মৃত্যোশ্চাক্ষয় কারিণী॥

—ঘেরণ্ড সংহিতা, ৩।১২

অর্থাৎ কণ্ঠদেশ সংকোচন পূর্বক হৃদয়ে চিবুক সংন্যস্ত করিলেই তাহাকে জালন্ধর বন্ধ বলা হয়। এই জালন্ধর বন্ধে ষোড়শবিধ আধার বন্ধ হইয়া থাকে এবং উহা মৃত্যুকে পরাজিত করে।

শিবসংহিতাতেও বলা হইয়াছে—

বদ্ধা গলশিরা জালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ॥

—শিবসংহিতা, ৪।৩৮

অর্থাৎ গল প্রদেশের শিরাজাল বন্ধনপূর্বক চিবুক বক্ষঃস্থলে সংন্যস্ত করিয়া কুম্ভক করিতে হয়।

যোগীগুরু ঘেরণ্ড বলিয়াছেন, জালন্ধর বন্ধে ষোড়শাধার বন্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ষোড়শাধার কি তাহাও জানা আবশ্যক। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য 'যোগী যাজ্ঞবল্ক্য' গ্রন্থে স্ত্রী গার্গীকে যোগোপদেশ প্রদান কালে লয়যোগ সাধনে চিত্তলয়ের আধার স্বরূপ ষোড়শাধার কি কি তাহাই বলিতেছেন। ১। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়, ২। পাদগুল্‌ফদ্বয়, ৩। গুহ্যদেশ, ৪। লিঙ্গমূল, ৫। নাভিমণ্ডল, ৬। হৃদয়, ৭। কণ্ঠকূপ, ৮। জিহ্বাগ্র, ৯। দন্তাধার, ১০। তালুমূল, ১১। নাসাগ্রভাগ, ১২। ভ্রূমধ্য, ১৩। নেত্রাধার, ১৪। ললাট, ১৫। মূর্দ্ধা এবং ১৬। সহস্রার। প্রয়োজন স্থলে দুইচারিটির সাধন কৌশল বর্ণনা করিব।

এখন 'জালন্ধর' কথাটির বিষয় কিছু বলি.—

কেহ কোন অলৌকিক কার্যকলাপ প্রকাশ করিলে অথবা ঐরূপ কোন কাহিনীর বর্ণনা করিলে লোকে বলিয়া থাকে, 'ওসব জালন্ধরী ব্যাপার'। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে যোগী জালন্ধরী একজন অলৌকিক দৈবী শক্তিসম্পন্ন যোগী পুরুষ ছিলেন। জলন্ধর শব্দের একটি অর্থ মেঘ-সমুদ্র। সিদ্ধ পুরুষ হাড়িপাদ জলের উপরে এবং শূন্যে অবলীলাক্রমে দিনের পর দিন ভাসিয়া থাকিতে পারিতেন, সেইজন্য হাড়িপাদের এক নাম জালন্ধরী পাদ বা জালন্ধরী নাথ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে যোগীগুরু হাড়িপাদের জন্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধর জেলায়, সেইজন্য হাড়িপাদের অপর নাম জালন্ধরী এবং তিনি এই মুদ্রা বা বন্ধ আবিষ্কার করেন বলিয়া এই মুদ্রার নাম জালন্ধর মুদ্রা বা জালন্ধর বন্ধ। এই উক্তি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। শিবসংহিতা নামক যোগশাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে—'বন্ধা গলশিরা জালং' অর্থাৎ গলপ্রদেশের

শিরাজাল সমূহ বন্ধ বা সংকোচিত করিয়া এই মুদ্রা সাধন করিতে হয়, সেইজন্য এই ক্রিয়ার নাম জালন্ধর বন্ধ বা জালন্ধর মুদ্রা। যোগীগুরু হাড়িপাদ এই বিশেষ মুদ্রার আবিষ্কারক বলিয়া তিনি জালন্ধরী নামে প্রসিদ্ধ। অথবা তিনি এই জালন্ধর মুদ্রা সহযোগে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেইজন্য তিনি জালন্ধরী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি যে জালন্ধর মুদ্রার সহযোগে সূর্যভেদ প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইয়াছিলেন 'ময়নামতীর গান'-এ তাহার প্রমাণ মিলে। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে হাড়িপাদ সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার জন্ম স্থান পাঞ্জাব প্রদেশের কোন এক স্থানে; সেইজন্য তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার জন্মস্থানের নামকরণ করা হইয়াছে 'জলন্ধর'। ঠিক যেমন যোগাচার্য গোরক্ষনাথের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার সাধনপীঠের নামকরণ করা হইয়াছে 'গোরক্ষপুর' বা 'গোরখ্পুর'।

এতক্ষণ শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের বেড়াজাল বুনিয়া আসিয়াছি, এখন সূর্যভেদ প্রাণায়ামের সাধন প্রণালীটি সরলভাবে বর্ণনা করিতেছি। সাধনেচ্ছু ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিবৃতিটি যত্নপূর্বক অনুধাবন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ করিবেন।

সাধক যোগগৃহে পদ্মাসনে উপবেসন করতঃ চিবুক বক্ষে সংলগ্ন করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করতঃ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া নাভিমূল হইতে সমান বায়ুকে বলপূর্বক উত্তোলন করিয়া প্রপূরিত বায়ুর সহিত কণ্ঠ সংকুচিত করিয়া কণ্ঠে ধারণপূর্বক কুম্ভক করিয়া থাকিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেশের অগ্রভাগ দিয়া ঘর্ম নির্গত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কুম্ভক করিয়া থাকিতে হইবে। কুম্ভকান্তে প্রপূরিত বায়ুকে ধৈর্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বাম নাসাপথে রেচন করিবেন। পরে পুনর্বার পূর্ববৎ দক্ষিণ নাসাপথে

পূরক, নাভি হইতে সমান বায়ুকে উত্তোলন ও কণ্ঠ সংকুচিত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়া কুম্ভক এবং শেষে বাম নাসাপথে রেচন করিবেন। সাধ্যমত-সময় পুনঃপুনঃ এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিলে একবার সূর্যভেদ প্রাণায়াম করা হইল। এইরূপ ব্রাহ্মমুহূর্তে, মধ্যাহ্নকালে, সন্ধ্যাকালে ও নিশাকালে চারিবার এই সূর্যভেদ প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে পারিলে ছয় মাসের মধ্যেই ফল লাভ করা যায়। সাধক জরা ও মৃত্যুকে করে পরাজিত, বৃদ্ধ লাভ করেন যৌবনোচিত শক্তি।

উজ্জায়ী প্রাণায়াম-- (শাস্ত্রান্তর মতে শীতকার প্রাণায়াম)

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বক্ত্রেণ বায়ুং ধারয়েৎ।
হৃদ্‌গলাভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ॥
মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জলন্ধরং ততঃ।
আশক্তি কুম্ভকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা, ৫।৬৮-৬৯

বহিস্থিত বায়ু নাসিকাদ্বয় দ্বারা এবং অন্তস্থ বায়ু হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা সমাকর্ষণ করিয়া কুম্ভক যোগে মুখ মধ্যে ধারণ করিবেন। অনন্তর মুখ প্রক্ষালনপূর্বক জালন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করিয়া শক্ত্যনুসারে কুম্ভক করতঃ নির্বিরোধে বায়ু ধারণ করিয়া থাকিবেন।

যোগ-সাধক ব্যক্তি উপযুক্ত স্থানে পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে উপবেসন করিয়া উভয় নাসাপথে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন। বায়ু আকর্ষণ কালে জালন্ধর মুদ্রা করিতে হয়, অর্থাৎ চিবুক বক্ষে সংস্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে ঐ প্রপূরিত বায়ুকে মুখে ধারণ করিয়া কুম্ভক করিয়া থাকিবেন। কুম্ভকান্তে জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করতঃ যত্নপূর্বক জিহ্বাকে তালুমূলে সংস্থাপিত করিয়া অবিরোধে বায়ু ধারণ করিয়া যথাশক্তি

কুম্ভক করিবেন। পুনঃপুনঃ এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হয় এবং দিবা রাত্রে চারিবার এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন।

উজ্জায়ী কুম্ভকের ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে যোগীরাট্ গোরক্ষনাথ বলেন,—

"উজ্জায়ীকুম্ভকং কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ।
ন ভবেৎ কফরোগঞ্চ ক্রূরবায়ুরজীর্ণকম্॥
আমবাতং ক্ষয়ং কাশং জ্বরপ্লীহা ন বিদ্যতে।
জরামৃত্যু বিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১২-২১৩

উজ্জায়ীকুম্ভক করিয়া সকল প্রকার কার্য সাধন করিবেন। ইহাতে কফ্‌রোগ, ক্রূরবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া দেহ অজর ও অমর হয়।

শীতলী প্রাণায়াম—

ইহাকে চলিত ভাষায় কাক চঞ্চু প্রাণায়াম বলে।

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৪

কাকের চঞ্চুর ন্যায় জিহ্বাকে কুঞ্চিত করিয়া কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করতঃ উদরে চালিত করিয়া ক্ষণকাল কুম্ভক করিয়া ধীরে ধীরে উভয় নাসাপথে বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। পুনঃপুনঃ এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হয়।

ইহার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে গোরক্ষদেব বলেন—

সর্ব্বদা সাধয়েদ্ যোগী শীতলীকুম্ভকং শুভম্।
অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব তস্য প্রজায়তে॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৫

যোগী ব্যক্তি এই শুভজনক শীতলী কুম্ভক সাধন করিবেন, তাহা হইলে কখনই অজীর্ণ ও কফ্‌পিত্তাদি রোগ জন্মিবে না।

ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম—

ভস্ত্রৈব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েৎ শনৈঃ॥
এবং বিংশতি বারঞ্চ কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকম্।
তদন্তে চালয়েৎ বায়ু পূর্ব্বোক্তঞ্চ যথাবিধি॥
ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভস্ত্রিকাকুম্ভকং সুধীঃ।
ন চ রোগো ন চ ক্লেশ আরোগ্যঞ্চ দিনে দিনে॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৬-২১৮

কর্মকারদিগের অগ্নি সন্দীপন যন্ত্রকে ভস্ত্রা বলে, ঐ ভস্ত্রা বা জাঁতাকলদ্বারা যেমন বায়ু পরিবাহিত হয়, সেইরূপ উভয় নাসিকা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ুকে পরিচালিত করিবেন।

এই প্রকারে বিংশতিবার পর্যন্ত বায়ুকে ক্রমশঃ পরিচালিত করতঃ কুম্ভক করিবেন। তৎপরে পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে যথা বিধানে বায়ুকে রেচন করিবেন।

সুধী ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করতঃ এই ভস্ত্রিকা-কুম্ভক তিনবার সাধন করিবেন। ভস্ত্রিকাকুম্ভক সাধন করিলে সাধকের কোন প্রকার রোগ বা কোন প্রকার ক্লেশ হয় না, পরন্তু দিনে দিনে শরীরে আরোগ্য বিরাজিত থাকে। এই ভস্ত্রিকা-প্রাণায়াম করিয়া যাহাতে হাঁপাইতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভ্রামরী প্রাণায়াম--

অর্দ্ধরাত্র্যতীতে কালে প্রাণিনাং শব্দনিবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকম্।

শৃণুয়াৎ দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভম্।
প্রথমং ঝিল্লীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরম্॥
মেঘ-ঝর্ঝর-ভ্রমরী-ঘণ্টা-কাংস্যন্ততঃপরম্।
তুরীভেরী-মৃদঙ্গাদি-নিনাদানক দুন্দুভিঃ॥
এবং নানাবিধঃ শব্দো জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য কথিতস্য চ যো ধ্বনিঃ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
এবং ভ্রামরী সংসিদ্ধঃ সমাধি সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
অতঃ সর্ব্ব প্রযত্নেন কুম্ভকং সাধয়েদিমম্॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১।২১৯-২২৪

অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে পর পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের কোলাহলের নিবৃত্তি হইলে আসনে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আবদ্ধ করিয়া পূরক কুম্ভকরূপ প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবেন। (প্রণায়ামের আভ্যন্তর বৃত্তি দেখুন)।

এই প্রকারে ভ্রামরীকুম্ভক করিবার কালে প্রথমতঃ দক্ষিণ কর্ণে অভ্যন্তরবর্ত্তী অতি মনোরম শব্দ সকল শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে ঝিল্লীনাদ বা ঝিঁঝিঁপোকা ডাকার ন্যায় শব্দ ও পরে বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে মেঘ, ঝর্ঝর, ভ্রমরগুঞ্জন, ঘণ্টাধ্বনি এবং কাঁসর বাদ্যের ন্যায় ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এবং পরিশেষে তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ এবং আনকদুন্দুভির ন্যায় ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতি রাত্রে এই ভ্রামরী প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে করিতে শরীর অভ্যন্তর হইতে পূর্বোক্ত নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে।

হৃদয়স্থিত অনাহত পদ্মের মধ্য হইতে ঐ যে শব্দ উত্থিত হয়, সেই শব্দের ধ্বনি অর্থাৎ প্রতিশব্দ শ্রুতিগোচর হইবে, পরে যোগী-ব্যক্তি নয়ন নিমীলিত অবস্থায় অন্তর মধ্যে সেই অনাহত পদ্মস্থ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন লাভ করিবেন। সেই দীপ কলিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে যোগিগণের মন সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরম পদে লীন হইবে। এইরূপে ভ্রামরী প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সত্বর সমাধি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা প্রাণায়াম—

সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রুবোরন্তরম্।
সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা॥
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবম্।
উৎপদ্যতে যত্নতো হি শিক্ষেত কুম্ভকং সুধীঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২৫-২২৬

সাধক পূর্বোক্ত প্রকারে স্বচ্ছন্দে কুম্ভক করিয়া মনকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নিবৃত্তকরণ পূর্বক ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে সংযুক্ত করিয়া পরমাত্মাতে লীন করিবেন। আত্মার সহিত মনের এইরূপ সংযোগ বশতঃ পরমানন্দ অনুভূত হয়।

সুধীব্যক্তিগণ যত্নপূর্বক সুখপ্রদ মনোমূর্চ্ছা নামক এই কুম্ভকের অভ্যাস করিবেন।

সাধন প্রণালীটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। সাধক পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসাপথে ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিবেন। এইরূপে শরীর আপাদমস্তক বায়ুদ্বারা পূরণ করিয়া জালন্ধরবদ্ধ মুদ্রা যোগে এবং রসনা তালুকুহরে প্রবিষ্ট করতঃ কণ্ঠে বায়ু ধারণ করিয়া সাধ্যমত কুম্ভক করিবেন। ঐ সময় দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া মনকে সকল প্রকার বৈষয়িক

ব্যাপার হইতে সরাইয়া লইয়া পরমাত্মায় লীন করিবেন অর্থাৎ ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন। পরে ঐ প্রপূরিত বায়ুকে উভয় নাসা পথে ধৈর্য্যের সহিত রেচন করিবেন। এই অনুষ্ঠান দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার অভ্যাস করিতে হয়।

মনোমূর্চ্ছা নামক এই কুম্ভক নিয়মিত অভ্যাস করিলে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাদোষ বিনষ্ট হয় ও শরীরে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বোধিতা হয়েন। সাধক ক্রোধাদি রিপুমুক্ত হইয়া শুচিমান্ হয়েন।

কেবলী প্রাণায়াম—

গ্রন্থান্তরে এই কেবলী প্রাণায়ামের নাম প্লাবনী **কুম্ভক**।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

রেচকং পূরকং মুক্ত্বা সুখং যদ্বায়ু ধারণং।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবল কুম্ভকঃ।

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।৬০

রেচক ও পূরক পরিত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু ধারণপূর্ব্বক যে প্রাণায়াম তাহাকে কেবলী কুম্ভক বলে।

যোগাচার্য গোরক্ষনাথ বলেন,—

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ।
একাধিক চতুঃষষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে॥

কেবলী মষ্টধা কুর্য্যাদ্ যামে যামে দিনে দিনে।
অথবা পঞ্চধা কুর্য্যাদ্ যথা তৎ কথয়ামি তে॥

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে মধ্যরাত্রি চতুর্থকে।
ত্রিসন্ধ্যামথবা কুর্য্যাৎ সমমানে দিনে দিনে॥

পঞ্চ বারং দিনে বৃদ্ধির্ব্বারৈকঞ্চ দিনে তথা।
অজপা পরিমাণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিৎ।
কুম্ভকে কেবলীসিদ্ধৌ কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে॥
—গোরক্ষসংহিতা, ২২৭-২৩১

রেচক ও পূরকহীন প্রাণায়াম কিরূপ তাহা প্রাণায়াম সাধন বর্ণনার প্রথমেই কুম্ভকের 'স্তম্ভবৃত্তি' আলোচনা কালে করিয়াছি। সাধনেচ্ছু ব্যক্তি ঐ স্তম্ভবৃত্তি কিরূপ একবার দেখিয়া লইবেন।

আসনে উপবেসন করিয়া উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অবিরোধে কুম্ভক করিয়া থাকিবেন। প্রথম দিনে এক হইতে চৌষট্টিবার পর্য্যন্ত 'হংস' বা 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করিবেন। প্রতিদিন অষ্ট প্রহরে আটবার এই কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহাতে অসমর্থ হইলে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, মধ্যরাত্রিতে এবং শেষ রজনীতে এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চবার কুম্ভক করিবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং ত্রিসন্ধ্যাকালে তিনবার করিবেন। যাবৎ অজপা সংখ্যক পরিমাণে জপসংখ্যা বৃদ্ধি না হয় অর্থাৎ ২১৬০০ বার (প্রতি মিনিটে ১৫ বার; ১৫ × ৬০ × ২৪ = ২১,৬০০) তাবৎ প্রতিদিনে পঞ্চবার অথবা একবার করিয়াও জপ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ প্রাণায়ামকেই যোগিগণ কেবলী প্রাণায়াম বলে। কেবলী প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই কুম্ভক অভ্যাসেই ক্রমশঃ সমাধি লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়। গোরক্ষগুরু মীননাথের ভাষায় বলি—

'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্মকু বঙ্গ সমাধিক পাট'

[(বাট = পথ, রঙ্গ = কৌশল, পাট = ক্রিয়াপদ্ধতি) ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' অর্থ বুঝাইতে কঁ বা কু শব্দের প্রয়োগ মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার নানা স্থানে আজও প্রচলিত দেখা যায়। যেমন 'তাকু কাম নয়' তাকু = তাহার, অনুরূপ কর্ম্মকু = কর্মের, সমাধিক = সমাধির।]

পূর্বোক্ত অষ্ট প্রকার প্রাণায়াম সাধনের ফলস্বরূপে গোরক্ষনাথ বলেন—

অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়াম পরায়ণঃ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণং নিরুদ্ধয়েৎ॥

প্রত্যাহার-সাধন

আসন ও প্রাণায়াম উত্তমরূপে আয়ত্ব হইলে পর যোগের পঞ্চমাঙ্গ 'প্রত্যাহার' সাধন অভ্যাস করিতে হয়। এ-স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যাহার-সাধন পূর্বোক্ত যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ চতুষ্টয় হইতে কঠিন। কারণ, প্রত্যাহার সাধনে মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে হয়। যোগ শাস্ত্রে একটি কথা আছে—

"ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথঃ মনোনাথস্তু মারুতঃ।"

ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মন এবং মনের অধীশ্বর মরুৎ বা বায়ু। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ প্রাণায়াম-সাধন দ্বারা মনকে বহুলাংশে বশীভূত করা যায়। মন কিছুটা বশীভূত হইলে তবেই প্রত্যাহার-সাধন করিতে পারা যায়।

এখন প্রত্যাহার কাহাকে বলে তাহাই বলি।

"স্ববিষয়া সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।"

—পাতঞ্জল দর্শন, সাধপাদ, ৫৪

অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যে স্ব স্ব গ্রহিতব্য রূপ শব্দাদির প্রতি আকৃষ্ট হয় বা ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয়গণের সেই সকল বাহ্যগতি ফিরাইয়া আনা বা তাহাদিগের সেই আসক্তি সমূহকে নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ নিজ নিজ উপভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হয়, সেই সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া চিত্তের অনুগত করিয়া রাখার নামই প্রত্যাহার।

যোগিবর গোরক্ষদেব বলেন,—

"চরতাং চক্ষুরাদীনাং বিষয়েভ্যো যথাক্রমং
যৎ প্রত্যাহরণঞ্চৈব প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।"

গোরক্ষসংহিতা, ২।১

অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ সর্বদাই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিচরণ করিতেছে, ঐ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে যথাক্রমে বিষয় হইতে আকৃষ্ট করাকে প্রত্যাহার বলে। অর্থাৎ বিষয়ের সম্পর্কাধীন ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধ করাকেই প্রত্যাহার বলে। অন্য এক প্রকার প্রত্যাহারের কথা যোগিবর গোরক্ষনাথ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, খেচরী মুদ্রার সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা কালে তাহার বর্ণনা দিব।

চক্ষু যখন কোন রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইবে বা পতিত হইবে তখন চক্ষু ইন্দ্রিয়কে সেই রূপ হইতে উঠাইয়া লইয়া রূপরহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিতে হইবে। অর্থাৎ চক্ষু সেই রূপকে মনের নিকট যাহাতে উপস্থাপিত করিতে না পারে তাহাই করিতে হইবে। কথাটা বিপরীত ভাবে বলি। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ-সাধন হইলে তবেই ইন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা শক্তি থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্বীয় গ্রহিতব্য বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। এ-স্থলে মনকেই স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই

অমনস্কযোগ বা যোগীর আনমন অবস্থা আর যোগিনীর—"চিত্তে সে ভ্রষ্টা।" ইহা করিতে সমর্থ হইলে চক্ষু মেলিয়া সব দেখিলেও কিছুই দেখা হয় না। কারণ মন তথায় থাকে অনুপস্থিত। আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি, 'ভাল করিয়া দেখি নাই,' 'ভাল করিয়া শুনি নাই' খাইয়াও বলি ভাল করিয়া আস্বাদ করি নাই। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুতো সকলই ছিল তথাপি ভাল করিয়া না দেখা, না শুনা বা না আস্বাদন করার কারণ কি? কারণ ইন্দ্রিয়ের ঐ সকল কার্যের সময় মন পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত ছিল না, ফলে ইন্দ্রিয় সকল বিষয় যথাযথ ভাবে চিত্তের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারে নাই। মনকে পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য করিতে পারিলে ইন্দ্রিয় কিছুই মনের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিবে না। অনুরূপ কর্ণ গীতাদি শব্দ, নাসিকা গন্ধ, জিহ্বা রস, এবং ত্বক্ স্পর্শ যাহাতে মনের নিকট অর্পণ করিতে না পারে তাহার জন্য মনকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দূরে রাখিতে হইবে। এখন কথা উঠিতে পারে মনকে রাখিব কোথায়? উত্তরে বলিব, অতীন্দ্রিয় মন স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে মনের যে অবস্থা হয় তাহা চিত্তের নিরুত্থান অবস্থা; মন হয় নির্বিকার। মন নির্বিকার হওয়ায় সব হইয়াও যিনি নির্বিকার, সেই নির্বিকার পরমাত্মায় মন সমাহিত হয়। মনের এই নিরুত্থান অবস্থা অল্পবিস্তর সকলেই অনুভব করিয়াছেন।

প্রত্যাহার সাধনের ফলস্বরূপ যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্॥" —সাধনপাদ, ৫৫

অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধনে ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয়।

ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইলে হাসিকান্না, সুখদুঃখ, স্তুতিনিন্দা মানাপমান কিছুই সাধককে বিচলিত করিতে পারে না। সাধক তখন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।

সাধকের তৎকালীন অবস্থা—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতিঃ মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
—শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, ১২।১৮-১৯

এখন সহজে কি ভাবে মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে আনা যায় তাহারই দুই একটি সাধন পদ্ধতি বলিতেছি।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে মন স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া বশীভূত হয়।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিষ্কম্প দীপশিখার প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলে মন স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জালন্ধর মুদ্রা করিয়া অর্থাৎ চিবুক বক্ষে সংন্যস্ত করিয়া জিহ্বা তালুমূলে স্থাপন করতঃ স্বীয় নাভির প্রতি তাকাইয়া থাকিলে মত্ত মাতঙ্গসম চঞ্চল চিত্ত ক্রমে স্থির হইয়া সধাকের বশীভূত হয়।

পথে চলিয়াছেন, পথচারিগণ সহসা কোন একটি বিশেষ দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। আপনি প্রত্যাহার সাধক, আপনি সেই দৃশ্য হইতে স্বীয় চক্ষুকে সরাইয়া লইবেন, কর্ণ যাহাতে ঐ সকল আলাপ-আলোচনা গ্রহণ না করে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্ম-চিন্তা করিতে করিতে সে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবেন। পথ চলাকালে নিম্নদৃষ্টি হইয়া পথ চলিতে অভ্যাস করিলে নয়নেন্দ্রিয় সহসা কোন রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবে না। ট্রামে, বাসে বা ট্রেনে চলিয়াছেন, সেই সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া কোন গ্রন্থাদি পাঠ অথবা আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া ইষ্টদেব স্মরণে নিমগ্ন থাকিলে ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রমে বশীভূত

হয়। নির্জনপ্রিয়তা প্রত্যাহার সাধনের আর একটি সহজতর উপায়। ‘নাথগুরু-বাণী’র একটি পদে আছে,—

“একাএকী সিদ্ধা থাকে, সাধু থাকে তুইজন।
কুটম্বেরা পাঁচ সাত, দশ বিশ সেনাগণ॥”

যোগ-সাধক ব্যক্তি একা থাকিতে অভ্যাস করিবেন। এই নিঃসঙ্গের সঙ্গী সাধকের ইষ্ট দেবদেবী। তিনি শিবই হউন, বিষ্ণুই হউন, আর কালীই হউন।

ফলকথা, কূর্মকে স্পর্শ করিলে কূর্ম যেমন তাহার অঙ্গসমূহ আপন দেহের মধ্যে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ প্রত্যাহার-পরায়ণ যোগী-পুরুষ ইন্দ্রিয়গণের গ্রহিতব্য বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিগণকে প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। এবং তখনই উহা সম্ভবপর হইবে যখন তিনি মনকে সেই ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবেন। একটা সরল দৃষ্টান্ত দিই।

বৈহ্যুতিক চুম্বক-যন্ত্রের মধ্য দিয়া তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইতে থাকিলে ঐ যন্ত্রটি লৌহকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলে চুম্বক-যন্ত্র আর কাজ করে না অর্থাৎ লৌহকে আর আকর্ষণ করে না। অনুরূপ মনরূপ তড়িৎশক্তি ও ইন্দ্রিয়রূপ চুম্বক-যন্ত্রের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় তাহার কার্যকারিতা শক্তি হারাইয়া ফেলে, ফলে লৌহরূপ আকর্ষণীয় রূপরসাদি বিষয় সমূহ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলেও ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। তাই বলিয়াছিলাম সব দেখিলেও কিছুই দেখা হয় না। প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় মনকে স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার যে সাধনা তাহাই প্রত্যাহার সাধনা। বড়ই কঠিন কাজ, বহু সময়েরও প্রয়োজন, তুই এক দিনে সফল হইবার নয়। সাধক ব্যক্তি ধৈর্য হারাইবেন না। ফল একদিন অবশ্যই পাইবেন।

ধারণা

যোগের ষষ্ঠাঙ্গ হইল ধারণা

যোগী পতঞ্জলি বলেন,—

'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।'

—পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ১

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা।

ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—

'নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধিজ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু বাহ্যে বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা।'

অর্থাৎ যমনিয়মাদি অভ্যাসদ্বারা রাগদ্বেষাদিশূন্য নির্মল চিত্ত হইয়া, কোন একটি আসন উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়া অনুদ্বেগজনক স্থানে আসনে বসিয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব গ্রহিতব্য রূপরসাদি বিষয় বস্তু হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া চিত্তের মধ্যে লয় করতঃ সেই চিত্তকে নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃদপদ্ম-মধ্যে কিংবা নাড়িচক্র (ষট্চক্র) প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে অথবা কোন ভূতে বা ভৌতিকে কিংবা কোন দেব-দেবীর মূর্তিতে আরোপণ করতঃ ধারণ করিয়া রাখার নাম 'ধারণা।' যেন ধৃত বিষয় হইতে চিত্ত কোনরূপেই স্খলিত বা বিচলিত না হয়। চিত্তকে দেশ তথা স্থান বিশেষে বন্ধ তথা বাঁধিয়া রাখার নামই ধারণা।

ধারণা সম্বন্ধে যোগাচার্য গোরক্ষদেব বলেন,—

'হৃদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
সমনোনিশ্চলত্বেন ধারণেত্যভিধীয়তে॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৩।২

মনকে নিশ্চলভাবে রাখিয়া, অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া হৃদয় প্রদেশে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতে যে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবধারণ করা, তাহাকেই ধারণা বলে।

পূর্বে বলিয়াছি যে মনকে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে অর্থাৎ বাহ্য ও স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই প্রত্যাহার। এখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য সেই প্রত্যাহৃত মনকে সাধকের ইষ্ট দেবতায় বা পরমাত্মায় আরোপণ করিয়া ধারণ করাই ধারণার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু নির্গুণ পরমাত্মায় চিত্তের ধারণা সহজসাধ্য নয়; তাই যোগী গুরুগণ প্রথমে হৃদয়ে পঞ্চমহাভূতে চিত্ত ধারণার নির্দেশ করিয়াছেন।

পার্থিবী ধারণা—পৃথিবীতত্ত্বের বর্ণ হরিতালের ন্যায়, পৃথ্বিবীজ 'লং' বা লকার, আকৃতি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, ইহার দেবতা ব্রহ্মা। এই তত্ত্বকে হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত করিয়া কুম্ভক যোগে ধারণ করাকেই পার্থিবী ধারণা বলে।

আম্ভসী ধারণা—জলতত্ত্বের বর্ণ শঙ্খ, শশী ও কুন্দকুসুমের ন্যায় ধবল। আকৃতি চন্দ্রবৎ, জলতত্ত্বের বীজ 'বং' বা বকার, ইহার দেবতা বিষ্ণু। হৃদয় মধ্যে এই তত্ত্বকে প্রকাশিত করিয়া কুম্ভক যোগে ধারণা করাকেই আম্ভসী ধারণা বা বারি ধারণা বলে।

আগ্নেয়ী ধারণা—অগ্নিতত্ত্বের স্থান নাভিস্থল, এই তত্ত্বের বর্ণ ইন্দ্রগোপকীট সদৃশ রক্তবর্ণ, অগ্নিতত্ত্বের বীজ 'রং' বা রকার,

আকৃতি ত্রিকোণ এবং ইহার দেবতা রুদ্রদেব। এই তত্ত্ব তেজঃপুঞ্জশালী, দীপ্তিমান্ ও সিদ্ধিদায়ক। নাভিস্থানে অথবা হৃদপদ্মে এই তত্ত্বকে প্রকাশিত করিয়া কুম্ভক যোগে ধারণ করিয়া রাখার নাম আগ্নেয়ী ধারণা।

বায়বী ধারণা—বায়ুতত্ত্বের বর্ণ অঞ্জন বা ধূম্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, বায়ুতত্ত্বের বীজ 'যং' বা যকার এবং ঈশ্বর ইহার দেবতা। এই তত্ত্ব সত্ত্বগুণময়। সাধন প্রভাবে হৃদয় মধ্যে এই বায়ুতত্ত্বের প্রকাশ সাধন করিয়া কুম্ভক যোগে ধারণ করাই বায়বী ধারাণ।

আকাশী ধারণা—আকাশতত্ত্বের বর্ণ বিশুদ্ধ সাগরবারির ন্যায়। আকাশতত্ত্বের বীজ 'হং' বা হকার এবং ইহার দেবতা সদাশিব। এই আকাশতত্ত্বকে যোগ প্রভাবে উদিত করিয়া একাগ্র মনে প্রাণবায়ুকে সমাকর্ষণ করতঃ কুম্ভক যোগে ধারণ করাকেই আকাশী ধারণা বলে।

ধ্যান

এখন যোগের সপ্তমাঙ্গ ধ্যানের কথা বলি

যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"তত্রপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

—পাতঞ্জলদর্শন বিভূতিপাদ, ২

ভাষ্যকার লিখিযাছেন,—'তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্।

অর্থাৎ ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে তাহা হইলে সেই একতানতাই ধ্যান আখ্যা

প্রাপ্ত হয়। প্রত্যাহার দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধ পূর্বক অন্তরিন্দ্রিয় মনকে যে বস্তুতে ধারণা করা হয়, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি অনন্তরহিতভাবে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সেই মনোবৃত্তি প্রবাহই 'ধ্যান' নামে আখ্যাত হয়।

পরম চৈতন্য সত্ত্বার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তির গুণাবলী অনুভব করিতে বা হৃদয় মধ্যে জাগ্রত করিতে আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ, আকৃতি, হস্তপদাদি এবং আয়ুধের বর্ণনা করিয়া যে মূর্তির চিন্তা করি সাধারণ লোকে তাহাকেই ধ্যান বলে। কিন্তু ঐ ধ্যান তখনই সার্থক হয় যখন দেবদেবীর ধ্যেয় রূপ বর্ণনা মধ্যে চিত্তবৃত্তি প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। যে সাধক ইহা করিতে সমর্থ হ'ন তিনিই দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন; মৃন্ময় দেবতা হন প্রাণবন্ত বা জাগ্রত। ফলকথা দেবতার সহিত চিত্তের একতানতাই ধ্যান।

ধ্যৈ + অনট্ = ধ্যান। সকল শাস্ত্রেই ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। ধ্যান শব্দের এই ধাতুগত অর্থ গ্রহণ করিয়াই যোগাচার্য গোরক্ষদেব ধ্যানের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—

স্মৃতৌ সর্ব্বত্র চিন্তায়া ধাতুরেকোহি পঠ্যতে।
যা চিত্তে নিশ্চলা চিন্তা তত্র ধ্যানং প্রচক্ষতে॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৩।১১

অর্থাৎ মনেতে যে কোন বিষয়ের নিশ্চলরূপে চিন্তা, তাহাই ধ্যান। অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কোন একটি বিষয়কে ধীর ভাবে চিন্তা করার নাম ধ্যান।

'সন্নিধায়তি তদ্ধ্যানং সগুণং নির্গুণন্তথা।
সগুণং বর্ণভেদেন নির্গুণং কেবলং ভবেৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৩।১২

ধ্যান দুই প্রকার। সগুণ ও নির্গুণ। গণপতি, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও আদ্যা প্রকৃতি অথবা ষট্‌চক্রস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ধ্যান করার নাম সগুণ ধ্যান। পরমব্রহ্মের অথবা সহস্রারস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করাকে নির্গুণ ধ্যান বলে। ইহা ব্যতীত যোগিগণ অন্য এক প্রকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তাহাকে জ্যোতিঃ ধ্যান বলে।

প্রগাঢ় ধ্যানই সগুণ ব্রহ্মকে ক্রমে নির্গুণভাবে সন্নিধাপিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ সগুণ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তের বিনাশ হইয়া যায়, তখন সগুণভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি আর হয় না। সেই সময়ে হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে একব্রহ্মের উপলব্ধি হইতে থাকে। অতএব, ধ্যানের প্রথমাবস্থায় যাহা সগুণ, ধ্যানের চরম বা পরিপক্কাবস্থায় তাহাই নির্গুণ ধ্যানে পর্যবসিত হয়।

সমাধি

যোগের অষ্টমাঙ্গ সমাধি। নির্গুণ ধ্যানই ক্রমে চিত্তের বিলোপ সাধন করতঃ সাধকের সমাধির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়।

যোগী পতঞ্জলি বলেন,—

'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।'

—পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ৩

কেবল সেই স্বপ্রকাশ আত্মা আছেন, এইরূপ আভাস জ্ঞানমাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, চিত্তের ধ্যেয় বস্তুতে যে তন্ময়তা অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের লয় হইয়া যাওয়ার নাম সমাধি। ভাষ্যকার বলেন,—'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং

প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।' তদেতদ্ ধারণাধ্যানসমাধি ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। অর্থাৎ প্রগাঢ় ধ্যান যখন কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত করিবে, 'আমি ধ্যান করিতেছি' এরূপ ভেদজ্ঞানও যখন লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন সেই অবস্থাকেই সমাধি অবস্থা বলা হয়। ধ্যান প্রগাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক দশায় সাধকের ধ্যান জ্ঞানও থাকে না। চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয় বস্তুতে লীন হইয়া ধ্যেয়াকার বা ধ্যেয়স্বরূপ হইয়া যায়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হয়। চিত্তের এতাদৃশ অবস্থার নাম সমাধি।

'ত্রয়মেকত্র সংযমঃ'।—বিভুতিপাদ, ৪

কোন এক আলম্বনে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাম সংযম। কোন বস্তু বা বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তে সেই বস্তু বা বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়। তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

'তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ'

—পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ৫

যোগাচার্য গোরক্ষনাথ বলেন,—

'উভয়োরাত্মনোরেকঃ সমাধিশ্চ বিধীয়তে।
যথা সংক্ষীয়তে প্রাণো মনসশ্চ বিলীয়তে॥'

—গোরক্ষসংহিতা, ৩৩১

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের একতা জ্ঞানই সমাধি। সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি ক্রমে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন কেবল এক আত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

অবধুত মার্গের আচার্য রাজযোগী দত্তাত্রেয় বলেন,—

নির্গুণ ধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সমভ্যসেৎ।
বায়ু নিরুধ্য মেধাবী জীবন্মুক্তো ভবেৎ ধ্রুবম্।
সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ॥

—দত্তাত্রেয় সংহিতা

অর্থাৎ নির্গুণ ধ্যানসম্পন্ন ব্যক্তি সমাধিযোগ অভ্যাস করিবেন। কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ করিলে সাধক জীবন্মুক্ত হ'ন; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাকে সমাধি বলে। তদ্ভিন্ন কেবল একাগ্রচিত্ত হইলেই যে সমাধি হয় তাহা নহে। তাই যোগবাশিষ্টে বলা হইয়াছে,—

'প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন চ তুষ্ণীমবস্থিতিঃ।'

সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ফল কথা, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 'আমি' জ্ঞান থাকে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এই 'আমি' জ্ঞান থাকে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। তাই বলা হইয়াছে,—সমাধি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ।

মনস্থির করিবার উপায়

যোগ সাধনার আটটি অঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। নানা শাস্ত্রের তর্কজাল বুনিলে একদিকে তাহা যেমন অকারণ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে, অপর দিকে সাধকের যোগ সাধনায় নানারূপ সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া সাধনার পথ দীর্ঘ করিয়া দেয়। সেইজন্য আমি বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়া কয়েকটি সাধন পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। সাধন মার্গে সিদ্ধিলাভ করিতে

হইলে মনই প্রধান. হাতিয়ার। তাই প্রথমে মনস্থির করিবার দুই একটি সহজ পন্থা জানাইতেছি। এই পদ্ধতি উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য সাধনায় রত হইলে সত্বর ফল লাভ করা যায়।

যিনি যে আসন উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়াছেন তিনি সেই আসনে উপবেশন করিয়া মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সরল ও সমভাবে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিবেন। পরে চিবুক বক্ষে ন্যস্ত করিয়া স্বীয় নাভি মণ্ডলে মন ও দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবেন। নিঃশ্বাস যত ছোট বা হ্রস্ব হইয়া আসিবে মনও ততই স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে। মন-স্থির করিবার ইহাই সহজতম কৌশল।

কোন ধ্যান ধারণায় মন নিযুক্ত করিবার সময় যদি বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়, তবে মন যে বিষয়ে ধাবিত হইবে সেই বিষয়ে আত্মানুভবে সমরস বোধে ব্রহ্মময় চিন্তা করিয়া চিত্তকে ধারণা করিতে হইবে। মত্ত মাতঙ্গসম চঞ্চল চিত্ত ক্রমে বশীভূত হইয়া আসিলে সেই বশীভূত চিত্তকে তখন অভীষ্ট ধ্যেয় বস্তুতে আরোপণ করিয়া সাধনায় রত হইবেন।

পূজা করিবার সময় শালগ্রাম শিলায় অথবা শিবলিঙ্গে যে নাদ বিন্দু চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করা হয়, সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে মন অতি সত্বর স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

ত্রাটক-যোগ সাধন

ত্রাটক অভ্যাস করিলে মন সত্বর স্থির হয়। ত্রাটক কি তাহাই বলি—

নিমেষোন্মেষকং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্ম লক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ
যাবদশ্রু নিপাতঞ্চ ত্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ

আয়ত্তীকৃত আসনে সুখে উপবেশন করিয়া কোন একটি সূক্ষ্ম লক্ষ্যে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে হইবে। যাবৎ চক্ষু দিয়া জল বিনির্গত না হয় তাবৎ ঐ ভাবে চাহিয়া থাকিতে হইবে। এই সাধনায় চক্ষুর সমস্ত দোষ নষ্ট হয়, নিদ্রা তন্দ্রাদি আয়ত্তীভূত হয় এবং চক্ষুর রশ্মি বহির্গমন প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে অতি সহজে সকলকে বশীভূত করা যায়। নয়নের সমসূত্রপাতে দেওয়ালে একটি কজ্জল বিন্দু দিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে অভ্যাস করিলে ভাল হয়। অথবা সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া দর্পণ প্রতিবিম্বে স্বীয় নয়ন যুগলের উপর স্বীয় নয়নযুগল স্থাপন করিয়া যাবৎ চক্ষু দিয়া জল না পড়ে তাবৎ নিমেষোন্মেষ বর্জ্জিত হইয়া চাহিয়া থাকিতে অভ্যাস করিবেন। দিবা রাত্রে তিন চারি বার অভ্যাস করিলে ছয় মাসের মধ্যেই ফল পাইতে পারা যায়।

ইষ্টদেবতা দর্শন—

নারায়ণের ধ্যানে বলা হইয়াছে—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।

নারায়ণের অধিষ্ঠান ভূমি সূর্য। তিনি সূর্যমণ্ডল মধ্যে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেবতার অধিষ্ঠান ভূমিও সূর্য।

দর্শনের উপায় এইরূপ—সাধক প্রথমে একদৃষ্টে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাকাইয়া থাকিতে অভ্যাস করিবেন। প্রথম প্রথম চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া তাকাইতে অভ্যাস করিলে কষ্ট হয় না। ক্রমাভ্যাসে দৃষ্টি গাঢ় হইলে নির্মল ও নিশ্চল জ্যোতিঃ নয়নে প্রতিভাত হইবে। তখন আপন ইষ্টদেবতার

মূর্তি চিন্তা করিতে করিতে সূর্যের জ্যোতিঃ মধ্যে ইষ্টদেবতার মূর্তি দর্শন লাভ হইবে। তাড়াহুড়া না করিয়া ধৈর্যের সহিত এই সাধনায় রত হইবেন।

হংসতত্ত্ব ও প্রণবতত্ত্ব

অজপা গায়ত্রী সাধন –

মানবদেহের হৃদয় পুণ্ডরীকে অনাহত চক্র অবস্থিত। ঐ চক্রে বা পদ্মে ত্রিকোণাকার পীঠে বায়ুবীজ 'যং' অবস্থিত। জীবাত্মা অহং ভাব অবলম্বন করিয়া এই অনাহত চক্রে সদা অবস্থান করিতেছেন। এই জীবাত্মাই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, তাই ইনি ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সদা সর্বদাই ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন। তাহাতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহাই সোঽহং বা হংস ধ্বনি।

সোঽহং-হংস-পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

হংসের বিপরীত সোঽহং। জীব সর্বদা এই সোঽহং মন্ত্র জপ করিতেছে। শ্বাসবায়ুর নির্গমন সময়ে 'হং' ও গ্রহণ সময়ে 'সঃ' এই শব্দ ধ্বনিত বা উচ্চারিত হয়। হং শিবস্বরূপ, সঃ শক্তিস্বরূপা।

হংকারো নির্গমেপ্রোক্ত সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥

—স্বরোদয় শাস্ত্র ১১।৭

প্রকৃত পক্ষে এই হংসই জীবের জীবাত্মা। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"হংস ইতি জীবাত্মানং"

এই হংসঃ মন্ত্র জপকেই অজপা গায়ত্রী জপ বলে। জপকালে হংসের বিপরীত সোঽহং করিয়া জপ করিতে হয়। মুখে বলুন

আর নাই বলুন সোঽহং চিন্তাই অজপা জপ। বর্তমান যুগের কোন এক সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াছেন,—

চির আশ্বাসে
দৃঢ় বিশ্বাসে
প্রতি নিঃশ্বাসে
লহ নাম—মধু নাম।

এই মধু নাম সেই মধু নাম—যাহা

সোঽহং-হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা

এই হংসঃ ধ্বনিই প্রণবের নামান্তর। ওঙ্কারই ব্রহ্মের আদি নাম। তাই 'ওঁ'-ই শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্ম সাক্ষাৎ দেবতা সদাশিব রূপে জীবদেহে অনাহত চক্রে অবস্থান করিতেছেন।

পরাপরিমলোল্লাস তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"শব্দ ব্রহ্মেতি তাং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥"

অনাহত চক্রের এই হংস ধ্বনিই প্রণব বা ওঁ কার। হংসঃ বিপরীত সঃ হং বা সঃ অহং, সন্ধি করিলে হয় সোঽহং—এখন স ও হ'য়ের, লোপ করিলে হয় ো ং=ওং বা ওঁ থাকে। যোগ স্বরোদয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

হকারঞ্চ সকারঞ্চ লোপয়িত্বা ততঃ পরং।
সন্ধিং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোঽসৌ মহামনু॥

ওঁকারে তিন দেবতা—

শিবো ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুরোঙ্কারে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অ+উ+ম=ওম্=ওঁ

অ-কার ব্রহ্মা, উ-কার বিষ্ণু এবং ম-কার মহেশ্বর। অকারের রূপ লোহিত, উ-কারের রূপ পীত এবং ম-কারের রূপ শ্বেত।

অ-কার ইচ্ছা শক্তি, উ-কার ক্রিয়াশক্তি এবং ম-কার জ্ঞান শক্তি। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "ত্রয়ী·ধর্ম্মঃ সদাফলঃ। অর্থাৎ ত্রয়ীধর্ম বিশিষ্ট প্রণবধর্ম সর্বদা ফলদাতা। ওঁ কারকে ত্রয়ী বলে। সেই জন্য গায়ত্রীর আদি, মধ্য ও অন্তে প্রণব যোগ করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। সুখাসনে সরল ভাবে বসিয়া প্রণব মন্ত্র জপ করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রণব বা ওঁকার ধ্বনির উৎপত্তি কেন্দ্র ব্রহ্মগ্রন্থি বা নাভিচক্র। উহা বিষ্ণুগ্রন্থি বা অনাহত চক্র অতিক্রম করিয়া রুদ্রগ্রন্থি বা আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যাইয়া লয় হইবে।

কুলকুণ্ডলিনী সাধন বা প্রকৃতি-পুরুষ যোগ

যোগসাধনার যত প্রকার প্রণালী আছে তন্মধ্যে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য বা জাগরণ ও কুণ্ডলিনী উত্থাপন বা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রদল- পদ্মচক্রে পরমপুরুষ শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বা পরাপ্রকৃতির মিলন সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধনা। বস্তুতঃ পক্ষে কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য ব্যতীত কোন সাধকই সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হ'ন না। গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥

অর্থাৎ মূলাধার পদ্মস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যাবৎ জাগরিতা না হ'ন, তাবৎ মন্ত্রাদি জপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল।

পুণ্য প্রভাবে যদি সেই দেবী জাগরিতা হ'ন, তবেই মন্ত্রাদি জপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা সিদ্ধ হয়।

প্রকৃতি-পুরুষ যোগ বা কুণ্ডলিনী উত্থাপন সাধন করিবার পূর্বে কুণ্ডলিনীর স্বরূপ ও চক্রসমূহ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য অগ্রে সেই সকলের কিছু বর্ণনা দিয়া পশ্চাৎ সাধন প্রণালী বর্ণনা করিব।

কুলকুণ্ডলিনী—

যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ—

মহাকুণ্ডলিনীং শক্তিং যো ভজেত্তু ভূজঙ্গিনীম্।
স কৃতার্থঃ স ধন্যশ্চ স দিব্যঃ বীর সত্তমঃ॥

অর্থাৎ ভুজঙ্গিনী রূপিণী মহাকুণ্ডলিনী শক্তিকে যে সাধক ভজনা করেন তিনি কৃতার্থ ও ধন্য এবং সাধনমার্গে তিনিই যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ।

কুণ্ডলিনী শক্তি ভুজঙ্গিণীস্বরূপা, ইনি স্বর্ণবর্ণতেজঃ স্বরূপ দীপ্তিমতী এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের প্রসূতি ব্রহ্মশক্তি। ইনিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি নামে বিভক্ত হইয়া শরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইনিই জীবের জীবনী শক্তি।

চক্র বা পদ্ম—সাধারণভাবে আমরা বলিয়া থাকি যে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রদলচক্রে পরমপুরুষ শিবের সহিত পরাপ্রকৃতির মিলন সাধন করিতে হয়; তাহাতে ষট্‌চক্র ও সহস্রার লইয়া সাতটি চক্র হয়। বস্তুতঃপক্ষে মনশ্চক্র বা সোম-চক্র, ললনাচক্র ও গুরুচক্র নামে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র আছে। ষট্‌চক্র ভেদ বলিবার কারণ যে আজ্ঞাচক্র নামক ষষ্ঠচক্র ভেদ করিতে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। ছয়টি চক্র ভেদ করিতে পারিলে অপর চক্রগুলি ভেদ করিতে সাধককে

আর বেগ পাইতে হয় না। লৌহ যেমন চুম্বকের সমীপবর্ত্তী হইলে চুম্বক লৌহকে আপনিই আকর্ষণ করিয়া লয়; সেইরূপ কুণ্ডলিনী শক্তিকে সাধনার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিতে পারিলে সহস্রদলপদ্ম চক্রস্থিত পরমপুরুষ শিব ঐ কুণ্ডলিনী-শক্তিকে আপনিই আকর্ষণ করিয়া ল'ন। তাই এই সাধনাকে ষট্‌চক্র ভেদ সাধনাও বলে। এখন চক্রগুলি কি কি, মানবদেহে কোন্ কোন্ স্থানে তাহাদের অবস্থিতি এবং চক্রসমূহের স্বরূপই বা কিরূপ তাহাই বলি। প্রাণতোষিণী নামক তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোর্দ্ধে বর্ত্ততে মহৎ।
লিঙ্গমূলে তু পীতাভং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়দলম্॥
তৃতীয়ং নাভিদেশে তু দিগ্‌দলং পরমাদ্ভুতম্।
অনাহতমিষ্ঠপীঠং চতুর্থ কমলং হৃদি॥
কলাপত্রং পঞ্চমন্তু বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।
আজ্ঞায়াং ষষ্ঠকং চক্রং ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিপত্রকম্॥
চতুঃষষ্টিদলং তালুমধ্যে চক্রন্তু মধ্যমম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রেঽষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভম্॥
নবমন্তু মহাশূন্যং চক্রন্তু তৎ পরাৎপরম্।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে পদ্মং সহস্রদলমদ্ভুতম্॥

মূলাধারচক্র বা আধারপদ্ম—মানবদেহের গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে চারি অঙ্গুলি পরিমিত যে স্থান তাহারই নাম যোনিমণ্ডল। এই যোনিমণ্ডলের উপরে মূলাধারপদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং চতুর্দ্দল বিশিষ্ট। এই চারিটি দল চারি মাতৃকা বর্ণাত্মক। যথা—ব শ ষ স। প্রত্যেক দলে এক একটি বৃত্তি। চারি বর্ণের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অষ্টশূল শোভিত চতুষ্কোণ পৃথ্বিমণ্ডল। পৃথ্বিমণ্ডলের বীজ 'লং', দেবতা

ইন্দ্র। এই ইন্দ্রদেব চারিহস্তবিশিষ্ট, পীতবর্ণ এবং শ্বেত হস্তীর উপর উপবিষ্ট। ইন্দ্রের ক্রোড়ে চতুর্ভুজ শিশু-ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার ক্রোড়ে ডাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা, ইনি রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা ও সালঙ্কৃতা।

'লং' বীজের দক্ষিণ পার্শ্বে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ মণ্ডল। ত্রিকোণ মণ্ডলের বীজ 'ক্লীং'। এই কামকলারূপ ক্লীং বীজে কন্দর্প নামক স্থির বায়ুর অবস্থিতি। তাহার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, এই লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও কোটি সূর্যের ন্যায় তেজোময়। এই স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের গাত্রে সাড়ে তিন পাক বেষ্টন করিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী-শক্তি আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ নিদ্রা যাইতেছেন। ইহারই অভ্যন্তরে চিৎশক্তি বিরাজিতা। এই কুণ্ডলিনীশক্তি সাধকের ইষ্টদেবী স্বরূপিনী। সাধনার মূলস্থান এবং মানবদেহের আধারস্বরূপ এই প্রথম চক্রটি তাই মূলাধারচক্র বা আধারপদ্ম নামে অভিহিত। এই পদ্মের ধ্যান করিলে সাধক গদ্যপদ্যাদি বাক্‌সিদ্ধি ও আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন।

স্বাধিষ্ঠানচক্র—স্বাধিষ্ঠান চক্রের অবস্থিতি লিঙ্গমূলে। এই চক্র অরুণ বর্ণ ও ষড়দল বিশিষ্ট। ষড়দল ছয় মাতৃকা বর্ণাত্মক; যথা,—ব ভ ম য র ল। প্রত্যেক দলে এক একটি বৃত্তি। পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার শ্বেতবর্ণ বরুণ মণ্ডল। বরুণ বীজ 'বং' দেবতা বরুণদেব। ইনি শ্বেতবর্ণ দ্বিভূজ ও মকরবাহন। বরুণ দেবের ক্রোড়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু। বক্ষে কৌস্তুভ মণি। বিষ্ণুক্রোড়ে তৎশক্তি রাকিনী। ইনি দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে শোভিতা, চতুর্ভূজা ও গৌরবর্ণা। এই পদ্মের ধ্যান করিলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আরোগ্য ও প্রতিভা লাভ হইয়া থাকে।

মনিপুরচক্র—মনিপুরচক্রের অবস্থান নাভিদেশে। এই চক্র মেঘবর্ণ ও দশদলবিশিষ্ট। দশদল দশ মাতৃকা বর্ণাত্মক;

যথা,—ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ। প্রতিদলে এক একটি বৃত্তি। পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল। বহ্নিবীজ 'রং' দেবতা অগ্নিদেব। ইনি চারিহস্তবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ এবং মেঘবাহন। অগ্নিদেবের ক্রোড়ে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ভস্মবিভূষিত সিন্দুরবর্ণ বরাভয়কর ত্রিনেত্র রুদ্রদেব। রুদ্রের ক্রোড়ে পীতবসনা, সালঙ্কারা, চতুর্ভুজা সিন্দুরবর্ণা লাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা। এই পদ্মের ধ্যান করিলে ঐশ্বর্যাদি সিদ্ধিলাভ হয়।

অনাহতচক্র—হৃদপদ্মের নাম অনাহতপদ্ম বা অনাহতচক্র। এই চক্র বন্ধুক কুসুমাভাস এবং দ্বাদশ দলযুক্ত। দ্বাদশদল দ্বাদশ মাতৃকা বর্ণাত্মক; যথা—ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ। এক কথায় 'কাদিঠান্ত' বর্ণাত্মক। দ্বাদশ দলে দ্বাদশটি বৃত্তি। এই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অরুণবর্ণ সূর্যমণ্ডল এবং ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল অবস্থিত। বায়ুবীজ 'যং' বীজমধ্যে ধূম্রবর্ণ চতুর্ভুজ বায়ুদেব কৃষ্ণসারাধিরোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। বায়ুদেবের ক্রোড়ে স্বর্ণ বর্ণ বাণলিঙ্গ শিব এবং তৎক্রোড়ে কাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজমানা। ইনি পীতবর্ণা বরাভয় লসিতা, ত্রিনেত্রা সালঙ্কারা এবং মুণ্ডমালিনী। সামগ্রীকভাবে এই বায়ুবীজ 'যং' এবং তন্মধ্যস্থ দেবতা সমূহই জীবের জীবাত্মা-পরমহংস। এই অনাহতপদ্ম ধ্যান করিলে অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধচক্র—কণ্ঠদেশে অবস্থিত ষোড়শদল বিশিষ্ট ধূম্রবর্ণ পদ্মের নাম বিশুদ্ধচক্র। ষোড়শদলে ষোলটি মাতৃকাবর্ণ, যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। ষোড়শদলে ষোলটি বৃত্তি। এই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল। তন্মধ্যে স্ফটিক বর্ণ আকাশ বীজ 'হং' অবস্থিত। বীজমধ্যে শ্বেতহস্তিবাহন আকাশ দেবতা। আকাশ দেবতার ক্রোড়ে ত্রিলোচন, পঞ্চানন ও দশবাহুবিশিষ্ট সদাশিব বিরাজমান। তৎক্রোড়ে শর, ধনু, পাশ,

ও শঙ্খযুক্তা চতুর্ভূজা পীতবসনা ও রক্তবর্ণা সাকিনি নাম্নী তৎশক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া বীরাজমানা। এই বিশুদ্ধপদ্মের ধ্যান করিলে জরা ব্যাধি ও মৃত্যুপাশ তিরোহিত হয়।

আজ্ঞাচক্র—ভ্রূযুগল মধ্যে অবস্থিত দ্বিদল বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ পদ্মের নাম আজ্ঞাচক্র, দুই দলে দুই মাতৃকাবর্ণ। যথা—হ ক্ষ। দুই দলে দুই বৃত্তি। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে নির্মল শ্বেতবর্ণ ত্রিকোণ মণ্ডল। মণ্ডলের তিন কোণে তিন দেবতা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মণ্ডলের মধ্যস্থলে শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ, 'ঠং', তন্মধ্যে চন্দ্রবীজ প্রতিপাদ্য শ্বেতবর্ণ বরাভয়যুক্ত চন্দ্রদেবতা। চন্দ্রদেবতার ক্রোড়ে ত্রিনেত্র জ্ঞান-দাতা শিব। (জ্ঞানদায় চ শিবম্) শিব-অঙ্কে শশিসম শুক্লবর্ণা ষড়বদনা, দ্বাদশভূজা হাকিনী নাম্নী তৎশক্তি বিরাজিতা।

আজ্ঞাচক্রের অপর নাম জ্ঞানপদ্ম বা জ্ঞানচক্র। এই পদ্মের উপরিভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান। তাই এই স্থানের নাম ত্রিকূট বা ত্রিবেণী। সাধকের গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন ক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থ। ত্রিকূটের উপরিভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডলে নাদবিন্দুরূপী শক্তিযুক্ত শিবের অবস্থান। আজ্ঞাচক্রের এই স্থানের ধ্যান করিলে যে জ্যোতিঃ দর্শন হয়, তাহাই আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন।

ললনাচক্র—তালুমূলে অবস্থিত চৌষট্টী দলবিশিষ্ট পদ্মের নাম ললনা চক্র। এখানে অহং তত্ত্বের স্থান। এইস্থানে অমৃতস্থালী অবস্থিত। খেচরী মুদ্রা যোগে এই অমৃত পান করিতে পারিলে সাধক দিব্যকান্তিবিশিষ্ট হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। খেচরী মুদ্রা বা অমৃততত্ত্বের সাধন প্রণালী পরে আলোচিত হইবে।

গুরুচক্র—ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত শতদলবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ পদ্মের নাম গুরুচক্র। এই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল।

মণ্ডলের তিন কোণে তিন বর্ণ হ ল ক্ষ। এই ত্রিকোণ মণ্ডলকে যোনিপীঠ বা শক্তিমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলে তেজোময় ৺নাদবিন্দু কামকলা মূর্তি। নাদোপরি হংসের তেজোময় পীঠ। হংসের শরীর জ্ঞানময়। আগম ও নিগম নামক তুইটি পক্ষ। হংসের তুই চরণ শিব ও শক্তি। প্রণব হংসের চঞ্চুপুট। নেত্র ও কণ্ঠ কামকলারূপ। এই হংসের উপর গুরুবীজ বা বাগ্‌ভব বীজ 'ঐং'। পার্শ্বে ঐং বীজ প্রতিপাদ্য গুরুদেব এবং তৎক্রোড়ে অরুণাভাযুক্তা সর্বাভরণভূষিতা গুরুপত্নী বিরাজিতা। শতদলপদ্মের মধ্যে গুরু ও গুরুপত্নীর ধ্যান করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয় এবং দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

সহস্রদলপদ্মচক্র—ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে মহাশূন্যে রক্তিমাভ শ্বেতবর্ণ সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মের নাম সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম। এই পদ্মে উপর্যুপরি কুড়িটি স্তর। প্রতি স্তরে পঞ্চাশটি করিয়া দল বা পাপড়ি। প্রতি স্তরের পঞ্চাশটি দল অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশ্ মাতৃকা বর্ণাত্মক। সহস্র দল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল আছে, উহা চন্দ্রমণ্ডল বা শক্তিমণ্ডল নামে অভিহিত। ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে হ ল ক্ষ বর্ণ। মধ্যে কোটি সূর্য-স্বরূপ তেজঃপুঞ্জ একটি শ্বেতবর্ণ বিন্দু আছে। এই বিন্দুই বিন্দু-রূপী পরমশিব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট ইনি বিভিন্ন নামে অভিহিত। ইনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্তা পরমেশ্বর। সাধন বলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করাকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বলে।

ঐ বিন্দু সতত গলিত সুধাস্বরূপ। ইহারই মধ্যে 'অমা' নামক কলা, ইনিই আনন্দ ভৈরবী। ইঁহার মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার নির্বাণ কামকলা বা নির্বাণ শক্তি। তৎপরে নিরাকার মহাশূন্য যাহা বাক্য ও মনের অতীত নির্গুণ পরমব্রহ্ম। যিনি 'অবাঙ্-মনসোঽগোচরঃ।

সহস্রদল পদ্মে একটি বৃক্ষ, নাম কল্পতরু বৃক্ষমূলে চতুর্দ্বার বিশিষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ মন্দির, মন্দির মধ্যে বেদিকা, বেদিকা-উপরি রত্নসিংহাসনে চনকাকার অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত মহাকালী ও মহারুদ্র। এই মন্দিরই সাধকের চিন্তামণি গৃহ; গৃহে মায়া বিমোহিত পরমাত্মা বা সগুণ পরমব্রহ্ম।

প্রকৃতি-পুরুষ যোগ বা কুণ্ডলিনীর উত্থাপন সাধনে সাধককে আরও কয়েকটি বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে।

গ্রন্থিত্রয়—নাভিদেশে মণিপুরচক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে, হৃদ্দেশে অনাহতচক্রকে বিষ্ণুগ্রন্থি বলে এবং ভ্রূযুগল মধ্যে আজ্ঞাচক্রকে রুদ্রগ্রন্থি বলে।

শক্তিত্রয়—গুহ্যদেশে মূলধার চক্রে অধঃশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা ব্রাহ্মীশক্তি। নাভিদেশে মণিপুর চক্রে মধ্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বা বৈষ্ণবীশক্তি। এবং কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে উর্দ্ধশক্তি, জ্ঞান-শক্তি বা গৌরীশক্তি।

ত্রিলোকী—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রকে নিম্ন ত্রিলোকী বলে। মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্রকে মধ্য ত্রিলোকী বলে। এবং বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল চক্রকে উর্দ্ধত্রিলোকী বলে।

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তি স্থিতালোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪

উপরি উক্ত তিন লোকে ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানরূপিনী তিন শক্তি। তৎপরে জ্যোতিঃ স্বরূপ ওঙ্কার বা সকল কালিমামুক্ত নিরঞ্জন।

নাথ সাহিত্য বলিয়া কথিত বঙ্গভাষায় রচিত গীতিকাব্যেও যোগেশ্বর শিব পার্বতীকে সকল তত্ত্ব বর্ণনা করিবার পর বলিতেছেন,

"যত কিছু কহিনু দেবী শুনিলা বিবরণ।
তাহা হইতে পর যেই সেই নিরঞ্জন॥

নির্গুণ পরমাত্মায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই; সুতরাং, গুণের আধার স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং তত্তৎশক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিও নাই। নির্গুণ ব্রহ্ম এ সকলের উপরে সকল কালিমা বা অঞ্জন মুক্ত, তাই তিনি যোগশাস্ত্রে সকল তত্ত্বের অতীত নিরঞ্জন। তন্ত্রান্তরেও বলা হইয়াছে "তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্"

অশ্বিনী মুদ্রা—কুম্ভক পূর্বক গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করাকে অশ্বিনী মুদ্রা বলে।

এখন কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও উত্থাপন প্রণালী গুরু-উপদিষ্ট জ্ঞানমত বর্ণনা করিতেছি।

সাধনেচ্ছু ব্যক্তি প্রথমে সাধনার উপযুক্ত নির্জন স্থান বাছিয়া লইবেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম, মৃগচর্ম, কম্বলাসন বা কুশাসনে সিদ্ধাসন, মুক্ত পদ্মাসন অথবা আয়ত্তিকৃত অন্য যে কোন আসনে সুখে উপবেশন করিবেন। লক্ষ্য রাখিবেন যেন এই সময় উদর আহার্যাদির দ্বারা পূর্ণ না থাকে; সম্মুখে ধূপ, দীপ জ্বালিয়া মনকে দেব-ভাবে আপ্লুত করিয়া লইবেন। পরে স্থির ভাবে সোজা হইয়া উপবেশন করতঃ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ জীবাত্মাকে মূলাধার চক্রস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সহিত একীভূত চিন্তা করিয়া আধারপদ্মস্বরূপ ভুজঙ্গিনী স্বরূপা কুণ্ডলিনীশক্তিকে মানসনেত্রে দর্শন করিতে হইবে। পরে 'হুঁ' এই কূর্মবীজ উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসিকা পথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া আধারপদ্মে চালিত করিতে চিন্তা করুন, আরও চিন্তা করুন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিতা ভুজঙ্গিনী কুণ্ডলিনীশক্তির চতুর্দিকে যেন কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। ইহাতে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তি কামাতুরা হইয়া জাগরিত হইবেন। তখন 'হংস' এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ুরোধ করতঃ অশ্বিনী মুদ্রা যোগে গুহ্যদেশ

সঙ্কুচিত করিলে মহাতেজময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি উর্দ্ধগামিনী হইবেন। সেই সময় কুণ্ডলিনী উর্দ্ধমুখ স্বাধিষ্ঠানে উঠাইয়া পুচ্ছমুখ দ্বারা আধারপদ্মস্থিত ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তিকে, পদ্মের চারিটি মাতৃকা বর্ণ, দেবতা ও বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিয়া লইবেন এবং পৃথ্বিমণ্ডলও লয় প্রাপ্ত হইবে; পৃথ্বিবীজ 'লং' পুচ্ছমুখে অবস্থান করিবে। তখন কুণ্ডলিনী ঐ পুচ্ছমুখও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইবেন। এই সময় মূলাধার পদ্ম ম্লান হইয়া মুদ্রিত ও অধোমুখী হইবে।

সাধককে সদাই মনে রাখিতে হইবে যে কুণ্ডলিনীশক্তি যখন যে পদ্মে যাইবেন তখন সে পদ্মকে বিকশিত ও উর্দ্ধমুখী ভাবনা করিতে হইবে, অন্যথায় পদ্মসকলকে মুদ্রিত ও নিম্নমুখী চিন্তা করিতে হইবে। কুম্ভক ও অশ্বিনী মুদ্রার প্রয়োগ ব্যতীত সমগ্র অনুষ্ঠানটিই মানসিক। সুতরাং মনকে অগ্রে এই সাধনায় সবিশেষ নিবিষ্ট করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনীশক্তি স্বাধিষ্ঠানপদ্মে আসিয়াই পূর্বমুখ মণিপুর পদ্মে উঠাইবেন এবং পুচ্ছমুখ দ্বারা স্বাধিষ্ঠান পদ্মস্থিত বিষ্ণু ও রাকিনী শক্তিকে, ছয়টি মাতৃকা বর্ণ, দেবতা ও বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিয়া লইবেন। কুণ্ডলিনীশক্তির পুচ্ছমুখস্থিত 'লং' বীজ বরুণ বীজ 'বং' এ পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর পুচ্ছমুখে অবস্থান করিবে। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি ঐ মুখও মণিপুর পদ্মে উঠাইবেন।

কুণ্ডলিনীশক্তি মণিপুরপদ্মে আসিয়াই পূর্বমুখ অনাহত পদ্মে উঠাইবেন এবং পুচ্ছদ্বারা মণিপুর পদ্মস্থিত রুদ্র ও লাকিনী শক্তিকে, দশটি মাতৃকা বর্ণ, দেবতা ও বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিয়া লইবেন। বরুণ বীজ 'বং' অগ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া অগ্নি ও 'রং' বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর পুচ্ছমুখে অবস্থান করিবে। তখন কুণ্ডলিনী ঐ পুচ্ছমুখও অনাহত পদ্মে উঠাইবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মণিপুর চক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবার সময়ে সাধকের মেরুদণ্ড মধ্যে চিনচিন করিবে।

এবং পৃষ্ঠে সামান্য বেদনা অনুভূত হইবে। কুণ্ডলিনীশক্তি যতটুকু উঠিবেন, মেরুদণ্ড মধ্যে ততদূর একটা সুড়্‌সুড়্‌ ভাব অনুভূত হইবে, শরীর রোমাঞ্চ হইবে ও মন অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিবে।

কুণ্ডলিনীশক্তি অনাহত পদ্মে আসিয়াই পূর্বমুখ বিশুদ্ধ পদ্মে উঠাইবেন এবং পুচ্ছমুখ দ্বারা বাণলিঙ্গ শিব ও কাকিনী শক্তিকে, কাদিঠান্ত দ্বাদশটি মাতৃকা বর্ণ, অনাহত পদ্মস্থিত সমস্ত দেবদেবী এবং বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিয়া লইবেন। 'রং' বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া বায়ু ও 'যং' বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনী-মুখে অবস্থান করিবে। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি ঐ পুচ্ছমুখও বিশুদ্ধপদ্মে উঠাইবেন। অনাহতচক্রের অপর নাম বিষ্ণুগ্রন্থি।

অতঃপর কুণ্ডলিনীশক্তি বিশুদ্ধপদ্মে আসিয়াই পূর্বমুখ ললনাচক্রে বা গুপ্তচক্রে উঠাইবেন ; এবং পুচ্ছমুখ দ্বারা বিশুদ্ধ পদ্মস্থিত অর্দ্ধনারীশ্বর শিব ও শাকিনী শক্তিকে, ষোড়শটি মাতৃকা বর্ণ, বিশুদ্ধপদ্মস্থিত দেবদেবী ও বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত বায়ুবীজ 'যং' আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া কুণ্ডলিনীর পুচ্ছমুখে অবস্থান করিবে। তখন কুণ্ডলিনী ঐ পুচ্ছমুখও ললনাচক্রে উঠাইবেন।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ললনাচক্রে আসিয়াই পূর্বমুখ আজ্ঞাচক্রে উঠাইবেন ; এবং অপর পুচ্ছমুখ দ্বারা ললনাচক্রস্থিত বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিয়া লইবেন। তখন কুণ্ডলিনী ঐ পুচ্ছমুখও আজ্ঞাচক্রে উঠাইবেন।

অনন্তর কুণ্ডলিনী আজ্ঞাপদ্মে আসিয়াই পূর্বমুখ দ্বারা জ্ঞানময় শিব ও রাকিনী শক্তিকে, মাতৃকাবর্ণদ্বয়, সত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণ, তিন গুণের তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তত্তৎশক্তি ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি এবং অন্যান্য সমস্তই গ্রাস করিয়া লইবেন। আকাশ বীজ 'হং' মনশ্চক্রে লয় হইয়া যাইবে। আজ্ঞাচক্রের অপর নাম রুদ্রগ্রন্থি।

আজ্ঞাচক্রের উপরি ভাগে যেখানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন স্থান, সেই স্থানে সুষুম্নার মুখে কপাটস্বরূপ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার মণ্ডল। কুণ্ডলিনী সোমচক্রের মধ্য দিয়া গমন করিবার কালে এই অর্দ্ধ চন্দ্রাকার কপাট ভেদ করিয়া যতই উর্দ্ধে গমন করিতে থাকিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে নাদবিন্দু হকারার্দ্ধ ও নিরালম্বপুরী প্রভৃতিকে গ্রাস করিয়া লইবেন। এই অর্দ্ধ চন্দ্রাকার কপাট ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলে অবস্থিত পরমপুরুষের সহিত সংযুক্তা ও একীভূতা হইয়া যান। তখন প্রকৃতি পুরুষের সামরস্য সম্ভূত অমৃতধারায় শরীর প্লাবিত হইয়া এক অপূর্ব আনন্দে হৃদয় ও মন ভরিয়া উঠে। পরমপুরুষের সঙ্গে সামরস্য সম্ভোগ করিবার পর পুনরায় কুণ্ডলিনীশক্তিকে আধার পদ্মে নামাইয়া আনিতে হয়। উপরি উক্ত চক্র ভেদের সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি মাত্র কুম্ভকযোগে সাধন করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনীশক্তিকে নামাইয়া আনিবার সময় সাধক সোঽহং' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করিতে থাকিবেন এবং মানস ক্রিয়াগুলি ঠিক বিপরীত ক্রমে চিন্তা করিতে থাকিবেন। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী উত্থাপন কালে যে যে চক্রে কুণ্ডলিনী, যে যে দেবতা, যে যে বর্ণ, যে সমস্ত বৃত্তি ও যে সকল বীজ গ্রাস করিয়াছিলেন, অবতরণ কালে সেই সেই চক্রে চক্রস্থিত দেবদেবী মাতৃকা বর্ণ, বৃত্তি ও বীজ সকলকে ত্যাগ করতঃ যথাস্থানে স্থাপন করিয়া আসিতে হইবে। এইরূপে কুণ্ডলিনী শক্তি পুনরায় আধার পদ্মে আসিয়া স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে সাড়ে তিন পাক বেষ্টন করিয়া পুনরায় নিদ্রিতা হইয়া যান। প্রত্যহ পুনঃপুনঃ এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হয়। অনলস হইয়া কয়েক মাস এই সাধনার অনুষ্ঠান করিলে সাধক কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

অমৃততত্ত্বের সাধন

অতি মিষ্ট ও সুস্বাদু অর্থে অমৃত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যাইলেও অমৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—অ-মৃত অর্থাৎ অমরত্ব বা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব। সুতরাং অমৃততত্ত্বের অর্থ অমরত্ব (Theory of immortality) বা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব (Doctrine of eternal life) লাভের সাধনতত্ত্ব।

মহাযোগী মহেশ্বর বলিতেছেন,—

"অহং বিন্দু রজঃশক্তিরুভয়োর্মিলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥
বিন্দুর্বিধুময়োজ্ঞেয়ো রজঃ সূর্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥

—শিবসংহিতা, ৪-৫৮-৫৯

স্বশরীরে শিব ও শক্তির অর্থাৎ বিন্দু ও রজের মিলন ঘটাইতে পারিলে সাধক দিব্যকান্তি লাভ করিতে পারেন। বিন্দু চন্দ্রতুল্য ও রজ সূর্যতুল্য; নিজ শরীরে সাধক যত্ন সহকারে চন্দ্রসূর্যের বা বিন্দু ও রজের মিলন সাধন করিবেন। স্বশরীরে রজ ও বিন্দুর বা শক্তি ও শিবের অবস্থান হইতেছে,—

"মূলাধারে বসেৎ শক্তি সহস্রারে সদাশিবঃ।"

মূলাধার চক্রে শক্তির অধিষ্ঠান এবং সহস্রদলপদ্মচক্রে বিন্দুরূপী শিবের অধিষ্ঠান। সাধক যোনিমুদ্রার সাহায্যে মূলাধার চক্রস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তোলন পূর্বক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রদলপদ্ম চক্রস্থিত বিন্দুর সহিত মিলন সাধন করাইবেন এবং বিধুময় সেই বিন্দু হইতে ক্ষরিত অমৃত, সুধা বা মধু পান করিয়া

কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে নামাইয়া আনিবেন। শৈবতন্ত্রে ইহাই কুলামৃত পান। এই সাধন-মার্গের সাধকই কৌলিক, কুলাচারী বা কুলীন। কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ ও উত্থাপন সাধন প্রণালী পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় সাধন পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি, যাহার অনুষ্ঠানে সহজেই সেই সুধা পান করা যায়।

আজ্ঞাচক্রের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে সহস্রদলবিশিষ্ট চক্র বা পদ্মের অবস্থান। পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকার এক পীঠ আছে, উহার নাম চন্দ্রপীঠ। ঐ পীঠের মধ্যস্থলে সূর্যের মত তেজোময় অথচ পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ একটি বিন্দু আছে। উহাই বিন্দুরূপী পরমশিব বা সগুণ পরমব্রহ্ম। ঐ বিন্দু হইতে সর্বদা সুধা বা অমৃত বিচ্যুত হইয়া কণ্ঠাকূপে ও শেষে জঠরে পতিত হইয়া জঠরানলে ভস্মীভূত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই অমৃত বা সোমরস নষ্ট হইতে না দিয়া যদি স্বয়ং জিহ্বা দ্বারা পান করিতে পারা যায়, তবে সাধক সর্ববিধ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। রাজযোগী দত্তাত্রেয়ানন্দ নাথ বলেন—

"কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে মারুতং ধারয়েদ্ দৃঢ়ম্।
নাভিস্থাগ্নিঃ কপালস্থ সহস্রকমলচ্যুতম্॥
অমৃতং সর্বদা স্রাবং বিন্দুত্বং যাতি দেহিনাম্।
যথাগ্নিশ্চ তদমৃতং ন পিবেচ্চ পিবেৎ স্বয়ম্॥"

—দত্তাত্রেয় সংহিতা

ইহাই ঋগ্বেদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞগণের পরিজ্ঞাত সোমরস। এই সোমরস পান করিয়া শিব হইয়াছেন মৃত্যুঞ্জয়। আবার এই তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি অবলম্বনে সাধক পরমশিবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাই 'শিব অমৃতগময়ং' এই অমৃত বা সোমরস পান করিবার কালে সাধকের এক অপূর্ব নেশা হয়, মনে হয় যেন মদিরা পান করিয়াছি।

এক অব্যক্ত অপার আনন্দে সাধকের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়, উহাই ব্রহ্মানন্দ। এই সাধনার নাগাল না পাইয়া কেহ মাদক লতাপিষ্ট রস কেহ বা মদ পান করিয়া মনে করেন সোমরস পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এক্ষণে, যে খেচরী মুদ্রা সাধনদ্বারা এই সোমরস পান করিতে হয় তাহা বর্ণনা করিতেছি। যোগিবর ঘেরণ্ড বলেন,—

রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ
কপাল কুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্মধ্যে গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

—ঘেরণ্ড সংহিতা।

পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া জিহ্বাকে উল্‌টাইয়া ধীরে ধীরে তালুমধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। পরে জিহ্বাকে আরও উর্ধ্বে চালনা করিয়া চন্দ্রদ্বীপে বা চন্দ্রপীঠে লইয়া পীঠস্থিত বিন্দুক্ষরিত সুধা বা অমৃত পান করিতে হইবে। এই সময় মধ্যে মধ্যে কণ্ঠকূপ রসে পূর্ণ হইয়া যাইবে, ঐ রস ফেলিয়া না দিয়া পান করিতে হইবে। ক্রমে নেশার ভাব আসিবে, ভীত বা চঞ্চল না হইয়া এই ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। এই খেচরীমুদ্রা সাধন কালে সাধক কুম্ভকপূর্বক কণ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বায়ু রোধ করিয়া রাখিবেন এবং দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ রাখিবেন। কয়েক মাস নিয়মিত অভ্যাসে সাধকের দিব্যকান্তি লাভ হইবে।

এখন কথা হইল জিহ্বা উল্‌টাইয়া তালুমধ্যে চালনা করিলেই উহা চন্দ্রপীঠে পৌঁছাইবে কিনা। জিহ্বাকে পাত্‌লা ও কিঞ্চিৎ লম্বা করিয়া লইতে হইবে। হঠযোগীরা জিহ্বার অগ্রভাগ ছিদ্র করিয়া তাহাতে লৌহের বালা পরাইয়া রাখেন; উহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জিহ্বা পাতলা ও লম্বা হইয়া যায়। আর একটি সহজতর উপায় হইতেছে যে, কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত

মধ্যের তিন অঙ্গুলি মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিনে তিন চারিবার গলা ও জিহ্বা পরিষ্কার করিলে কিছু দিনের মধ্যে জিহ্বা বেশ লম্বা ও পাতলা হইয়া যাইবে, তখন খেচরী মুদ্রার অভ্যাস আরম্ভ করিলে সত্বর ফললাভ করা সম্ভব হইবে।

ছায়াপুরুষ সাধন—আপন ভৌতিক দেহের জ্যোতির্ময় প্রতিবিম্ব দর্শন করাকে 'ছায়াপুরুষ সাধন' বলে। এই সাধন প্রণালী অতি সহজ। যখন আকাশ নির্মল ও পরিষ্কার থাকিবে সেই সময় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া অপলক নেত্রে আকাশ গাত্রে চাহিয়া থাকিলে ক্রমে শুক্ল জ্যোতিবিশিষ্ট নিজের ছায়া দৃষ্টি গোচর হইবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে চত্বরে এবং ক্রমশঃ চতুর্দিকে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সাধনায় সিদ্ধ হইলে সাধক গগনচর সিদ্ধ পুরুষদিগকেও দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। তখন সাধক আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আপন শুভাশুভ ও মৃত্যুকাল নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। রাত্রিতে নির্মল চন্দ্রালোকেও এই সাধন অভ্যাস করা যাইতে পারে।

ইষ্ট দেবতা দর্শন—সর্বদেবময় হরি। নারায়ণ সর্বদেবময়, তিনি সূর্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।' সুতরাং সূর্যমণ্ডল মধ্যে সর্বদেবময়ের দর্শন লাভ করা যাইতে পারে। দর্শনের উপায়—সাধক প্রথমে একদৃষ্টে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যাস করিবেন। প্রথম প্রথম কষ্ট হইবে, সুতরাং চোখে জলের ঝাপটা দিয়া সজল চোখে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে অভ্যাস করিবেন। অভ্যাস দৃঢ় হইলে নির্মল ও নিশ্চল জ্যোতি নয়নে প্রতিভাত হইবে। এই অবস্থায় আসিলে আপন ইষ্টমূর্তি চিন্তা করিতে করিতে সূর্যের জ্যোতি মধ্যে আপন ধ্যেয় ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইবে।

যোগ সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা

আধ্যাত্মিক জগতে যোগই উৎকৃষ্ট সাধনা। আপনারা হয়তো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য আরও তো বহু মত ও পথ আছে; সে সকলের অনুষ্ঠান না করিয়া আমরা যোগসাধনায় রত হইব কেন? অগ্রে এই প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা করি।

হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদিকে প্রধানতঃ দুটি কাণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বৈধ ও নিষিদ্ধ ভেদে কর্মকাণ্ডও আবার দুই ভাগে বিভক্ত। বৈধ কর্মের তিন শাখা; নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য, অন্যথায় প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়; নৈমিত্তিক কর্ম কার্যবিশেষে করণীয় এবং কাম্যকর্ম ইচ্ছাধীন। নিষিদ্ধ কর্ম করিলে পাপ হয়। সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম সদা পরিত্যাজ্য। বৈধকর্মের অনুষ্ঠানে ইহজীবনে সুখ-শান্তি ভোগৈশ্বর্য সম্মান ইত্যাদি ও দেহান্তে স্বর্গসুখ এবং নিষিদ্ধ কর্মে দুঃখ-কষ্ট অপমান ইত্যাদি ও দেহান্তে নরক যন্ত্রণা। বৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ বা নরক ভোগান্তে কর্মের সংস্কার বশতঃ সদসৎ কুলে অথবা পশ্বাদি হীন যোনিতে জন্মলাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন,

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।" ৮।১৬

পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তলোকই পুনরাবর্তনশীল। কর্মকাণ্ডের মন্ত্রাদিতে 'অক্ষয় স্বর্গকাম' বাক্যের প্রয়োগ করিয়া পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি সাধন করা হয় বটে, কিন্তু সাংসারিক জীবনে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগকাল যতই দীর্ঘস্থায়ী হউক না কেন উহা কখনও অনন্ত কালের জন্য হইতে পারে না। অতএব কর্মকাণ্ড

স্বর্গসুখের আস্বাদ থাকিলেও মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। জ্ঞানকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত। শুদ্ধজ্ঞান ও কর্মযুক্ত জ্ঞান। শাস্ত্রাদি পাঠে পাণ্ডিত্যমূলক যে জ্ঞান লাভ হয় আধ্যাত্মিক জগতে তাহা 'জ্ঞান' পদবাচ্য নয়। যোগাদি অনুশীলনের দ্বারা সাধক-হৃদয়ে স্বয়ং উদ্ভাসিত সমাধিলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান পদবাচ্য। কিন্তু এই জ্ঞান কর্মযুক্ত জ্ঞান। কারণ যোগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে এই জ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে না। এই সকল ক্রিয়ার অনুশীলনে সাধক কতকগুলি দৈবীশক্তি লাভ করেন,—যাহাকে বলা হয় বিভূতি। কর্মযুক্ত জ্ঞানলব্ধ এই সকল বিভূতিতে বিভ্রান্ত বা প্রলুব্ধ না হইয়া এই সকল বিভূতির প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করিতে পারিলে সাধকব্যক্তি শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তখন তিনি হন জীবন্মুক্ত বা মুক্ত যোগী। ঐ শুদ্ধ জ্ঞানটুকু লইয়া সাধকব্যক্তি সৎ চিৎ আনন্দে অর্থাৎ পরমপদে সদা যুক্ত হইয়া থাকেন; তাই তিনি যুক্তযোগী নামেও অভিহিত হন। ইহাই গীতোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি। এই ব্রাহ্মীস্থিতিলব্ধ যোগীই দেহান্তে নির্বাণ মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। এই কারণেই যোগ সকল প্রকার সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধনা।

যোগসাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা হইলেও যোগদর্শন কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন নাই। কর্মফলে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কর্ম আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়।

প্রকৃত বৈরাগ্য কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। হৃদয়ে অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণকারিণী অকাল বিধবার সমাজ শাসন ভয়ে ব্রহ্মচারিণী হওয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ নয়। সংসার প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া অথবা অপরাধীর রাজ-পুরুষের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া লোটা কম্বল সম্বল করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর দলে গা ঢাকা দিলেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। প্রকৃত বৈরাগ্য কি তাহা একটি গল্প ছলে বলি।

গোপীরা কৃষ্ণনাম গান করিতেছেন, এমন সময় তথায় কৃষ্ণ অসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত। গোপীরা বলেন, 'তুমি এখানে কেন ?' শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, "এই যে তোমরা আমাকে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেছিলে, তোমাদের ডাক শুনিয়াই তো আসিয়াছি।" গোপীরা বলেন, 'কৈ তোমাকে তো আমরা ডাকি নাই, কৃষ্ণনাম করিতে হয় তাই করিতেছিলাম, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নাই; তুমি যাইতে পার!' ইহাকেই বৈরাগ্য বলে। কর্মে নিষ্ঠা আছে, কর্মফলে আসক্তি নাই। এই নিঃস্পৃহতাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ভক্তিবাদে এইরূপ বৈরাগ্য অবলম্বনকারী সাধকই মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়া থাকেন।

একটি কথা হইতেছে যে সাধন মার্গে অধিকার ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

"উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো, ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো, বহিঃপূজাঽধমাধমা॥"

উত্তম অধিকারী সদাই ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করেন, মধ্যম অধিকারী ধ্যান-ধারণাদ্বারা ঈশ্বরকে উপাসনা করেন, অধম অধিকারী স্তব স্তুতি ও মন্ত্রাদি জপের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং অধমের অধম অধিকারী যাঁহারা—তাঁহারা বাহ্যিক পূজা অর্চনার দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন। উচ্চস্তরের সাধনায় রত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সেইভাবে নিজেকে উপযুক্ত করিয়া লইবেন। সেইজন্য যোগী পতঞ্জলি সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থাৎ সাধনার অধিকার অর্জন করিবার জন্য গোড়াতেই 'যম' ও 'নিয়ম' নামক দুইটি যোগাঙ্গ সাধনার নির্দেশ দিয়াছেন।

জীব জগৎ ও ব্রহ্ম

জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভেদ অথবা জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এই বিচার লইয়া হিন্দুধর্মে নানা মতের উদ্ভব। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন , "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" বৃক্ষলতাদি, নদী পর্বতাদি, গ্রহ নক্ষত্রাদি এবং জীবজন্তু ও মনুষ্যাদি যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি তৎ সমস্তই ব্রহ্ম। আবার শ্রুতির অন্যত্র বলা হইয়াছে,— "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, কিছু নাই। সৃষ্টির আদিতে যখন একমাত্র তিনিই ছিলেন—আর কিছুই ছিল না, তখন জীব ও জগৎ সৃষ্টির উপকরণ তিনি নিজ অংশ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্যথায় তিনি এইসব উপকরণ কোথা হইতে পাইলেন। সুতরাং চেতন জীব ও জড় জগৎ আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি তৎ সমস্তই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম যেমন সত্য ও নিত্য, ব্রহ্মের অভিব্যক্তি জীব ও জগতও সেইরূপ সত্য ও নিত্য।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদীর মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য, ইহা ব্যতীত আর সমস্তই মিথ্যা। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় আমরা নানা বস্তু দর্শন করি, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গের পর আর সে সমস্ত কিছুই থাকে না। অনুরূপ ভ্রমজ্ঞানবশতঃ আমরা জগৎকে সত্য বলিয়া জানিতেছি ও দেখিতেছি। ভ্রান্তি-জ্ঞান দূর হইলেই আর ঐ সমস্ত কিছুই থাকিবে না। এই ভ্রান্তি জ্ঞানকেই তাঁহারা মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। মায়ার কোন পৃথক্ সত্তা নাই, মায়া ব্রহ্মেই কল্পিত।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সত্য এবং জীব ও জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এই দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে আর একটি শ্রুতি বাক্যের

অবতারণা করি। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—

সোঽকাময়ত অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

তিনি (ব্রহ্ম) কামনা করিলেন, আমি বহু হইব বা আমি বহু প্রজা সৃষ্টি করিব। তিনি বহু নাম ও রূপ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় তিনিই বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্ম যিনি পূর্বে কেবল জ্ঞানময় বা জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এখন সেইস্থলে তাঁহার জ্ঞানশক্তির মধ্যে ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিব সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মের এই ইচ্ছাশক্তি বা কামনাকে মায়া বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হয় ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মের মায়া বা মায়ার পরিণামও সেইরূপ সত্য। ব্রহ্মের এই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিকে অবলম্বন করিযাই শক্তিবাদের উদ্ভব।

উপরি উক্ত আলোচনায় আমরা একটি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ পাই, আর একটি মিশ্রিত অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত মতবাদ পাই। কথাটি অনেকের নিকট নূতন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রজাপতি দক্ষ বলেন,—

দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈত তথৈবচ।
নদ্বৈতং নাপিচাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ;—দক্ষস্মৃতি।

দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ইহার মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত বা শুদ্ধ অদ্বৈত একপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত জ্ঞানই পারমার্থিক। এই দ্বৈত মিশ্রিত অদ্বৈত জ্ঞান কিরূপ? ধরুন, যেমন সোনার হাতি। সোনার হাতি বলিলে একদিকে যেমন হস্তী জ্ঞান জন্মে অপরদিকে সেইরূপ স্বর্ণ জ্ঞানও জন্মে। হস্তীটি কিসের? না, স্বর্ণের। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্কেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। হস্তীটিকে অগ্নির উত্তাপে গলাইলে আর হস্তী থাকে না, স্বর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবের জীবত্ব নাশ হইলেই জীব

ব্রহ্মস্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপই বা বলি কেন, জীব ব্রহ্ম হইয়া যান। একটি প্রচলিত বাক্য আছে,—"মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" মায়া বলুন, মহামায়া বলুন, প্রকৃতিই বলুন আর ইচ্ছা, ক্রিয়া জ্ঞানশক্তিই বলুন ইঁহারই দ্বারা বিমোহিত হইয়া, ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন। ব্রহ্ম মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া জীব হইয়াছেন বলায় মায়াকে পৃথক্ সত্তা বলিয়া মনে করিবেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, মায়া ব্রহ্মেই কল্পিত। 'নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়া' বলিয়া একটি কথা আছে, মায়া ব্রহ্মাশ্রয়ী হইলেও এখন ব্রহ্মই মায়াধীন। মায়া ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে,—যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রের জ্যোৎস্না। চন্দ্র বলিলে যেমন জ্যোৎস্নার কথা মনে আসে, আবার জ্যোৎস্না বলিলে তেমনি চন্দ্রের কথা মনে আসে, সেইরূপ মায়া ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ। দিবাভাগে যেমন চন্দ্র দৃষ্ট হইলেও চন্দ্রের জ্যোৎস্না দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া কখনও প্রকট, কখনও বা সুপ্ত। মায়া যখন প্রকট, ব্রহ্ম তখন সগুণ আর মায়া যখন সুপ্ত ব্রহ্ম তখন নির্গুণ। নির্গুণ অর্থে গুণের অভাব নয়, গুণ তথায় অন্তর্লীন মাত্র। ইহাই দ্বৈত মিশ্রিত অদ্বৈতবাদ।

বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্মে যদি পার্থক্য স্বীকৃত না হয় তবে কে-ই বা উপাসনা করিবে আর কাহারই বা উপাসনা করা হইবে। অপিচ জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য স্বীকৃত না হইলে যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি ও তপজপাদি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য। জীব আশ্রিত, ব্রহ্ম জীবের আশ্রয়। এই দ্বৈত জ্ঞান হইতেই ভক্তিবাদের উদ্ভব। শরণাগতিই ভক্তিবাদে মুক্তির পথ।

দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্র মতবাদ ব্যতীত আর একটি মতবাদ আছে তাহা হইতেছে অদ্বয় মতবাদ।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সম তত্ত্বং ন জানাতি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥

এই সমতত্ত্বই অদ্বয় মতবাদ। ইহাও একটি শ্রৌত মত। এই তত্ত্বে দ্বৈত ভাব নাই, অদ্বৈত ভাব নাই, মিশ্র ভাবও নাই। ব্রহ্ম সগুণও নন, নির্গুণও নন। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণের অতীত—গুণাতীত।

এখন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদটি কিরূপ, তাহাই বলি। ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় শ্রুতি বলেন, তিনি—

'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।'

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদির অতীত তিনি। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে,—"দিব্যোহি অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বা
বাহ্যাভ্যন্তরো হি অজঃ।
অপ্রাণা হি অমনাঃ শুভ্রোহি
অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"

ঐ দিব্য পুরুষ অমূর্ত—তাঁহার কোন রূপ নাই; তিনি অজ, সুতরাং তাঁহার কোন কারণ নাই; ঐ পুরুষ অপ্রাণা,—প্রাণ নাই, সুতরাং প্রাণের কার্য অর্থাৎ সৃষ্টিও নাই; অমনা, মনও নাই, সুতরাং মনের সঙ্কল্প অর্থাৎ কামনাও নাই; অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ, ঐ পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর হইতেও ভিন্ন; তিনি ক্ষর অর্থাৎ সগুণ, অক্ষর অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষ হইতেও ভিন্ন। তিনি সগুণ নির্গুণের অতীত। ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যায় পাতঞ্জল যোগদর্শন বলেন,—

"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ বিশেষ ঈশ্বরঃ।"

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর।

ঈশ্বর সমস্ত জীবাত্মা হইতে পৃথক। কারণ জীব কর্মের অধীন, তাই কর্মের সুখদুঃখ ফল ভোগ করেন। ঈশ্বর অকর্তা, ঈশ্বরের কর্ম নাই—তিনি ভোক্তাও নন। জীবের জন্ম-মৃত্যু ও আয়ু-ভোগ আছে, সুতরাং জীব কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ঈশ্বরেব জন্ম মৃত্যু নাই, তিনি অজ; সুতরাং অনাদি ও অনন্ত। জীবের প্রকাশক ঈশ্বর, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকাশক কেহ নাই। ঈশ্বর স্বপ্রকাশ। জীবের উপাধি আছে কিন্তু ঈশ্বর নিরুপাধিক। জীবের মন আছে, সুতরাং কামনা বাসনা আছে। ঈশ্বর অচিত্ত—অমনা, সুতরাং বাসনা রহিত। জীবের প্রাণ আছে, সুতরাং স্পন্দন-গতিশীলতা বা কার্য আছে। ঈশ্বর অপ্রাণা, সুতরাং ঈশ্বরের কার্য নাই, তিনি বিশ্ব ব্যাপক। এই সকল পার্থক্যের জন্যই জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রে তিন প্রকার ভেদের কথা বলা হইয়াছে,—

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্প ফলাঙ্কুরৈঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ো বিজাতীয় শিলাদিতঃ।" —পঞ্চদর্শী

একই বৃক্ষের পত্র পুষ্প ফল অঙ্কুর প্রভৃতিতে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। বৃক্ষে বৃক্ষে যে ভেদ অর্থাৎ আম্র বৃক্ষে ও বট বৃক্ষে যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ এবং বৃক্ষ ও প্রস্তরে যে ভেদ তাহা হইতেছে বিজাতীয় ভেদ। জীবে ও ব্রহ্মে যে ভেদ স্বীকার করা হয় তাহা স্বগত ভেদ মাত্র। শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পাদি যেমন বৃক্ষের একই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগৎ সেইরূপ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মই মায়াধীন হইয়া জীব ও জগৎ হইয়াছেন। সুতরাং এই আমিই সেই আমি, সেই আমিই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া এই আমি হইয়াছি। এই আমির লক্ষ্য সেই আমিতে মিশিয়া গিয়া 'এই' ও 'সেই'-এর দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া 'কেবল' আমি হওয়া।

ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ

হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। উহাদের সাহায্যে জীব জাগতিক কার্য সমূহ সম্পাদন করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও একটি ইন্দ্রিয় আছে, তাহা হইতেছে মন। মন অতীন্দ্রিয়, এই মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ দশটি ইন্দ্রিয় কার্য করিতে পারে না। 'প্রত্যাহার সাধনা' বর্ণনা কালে ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। ঐ দশটি ইন্দ্রিয় স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার বলা যাইতে পারে। বলা ও দেখা যথাক্রমে বাক্ ও চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কার্য। কিন্তু, মুখে কিছু না বলিয়াও তো আমরা মনে মনে অনেক কিছুই বলি ; চক্ষু দিয়া না দেখিয়াও তো আমরা কল্পনায় অনেক কিছুই দেখি। এইরূপ বলা ও এইরূপ দেখার কার্য ঐ দুই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগে সম্পাদিত হয়।

মন অণু পদার্থ। এককালে দুই বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না। কিন্তু আত্মা ব্যাপনশীল হওয়ায় আত্মার সহিত মনের সংযোগ সাধিত হইলে মনকেও ব্যাপনশীল বলা চলে। একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া কোন কার্য করিতেছি ; সহসা মন চলিয়া গেল দূরদেশে প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের কাছে, তাহাদের কথা মনে উদিত হইল। মন যখন দূরদেশে গেল, তখন ঐ কার্যটির প্রতি আকৃষ্ট মনটিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। মন অণু বিধায় দুই বিষয়ে একই সময়ে মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয় নাই। একটি সাধারণ উপমা দিই। মনে করুন, আপনার একটি

All wave Radio Set আছে ; ইচ্ছামত কাঁটা ঘুরাইয়া কখনও কলিকাতা, কখনও দিল্লী, কখনও বা ইয়োরোপ আমেরিকার খবর লইতেছেন। কিন্তু একই সময়ে একসঙ্গে তুই দেশের খবর লইতে সক্ষম হন কি? মনের ব্যাপনশীলতা সম্পর্কেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সর্ববিষয়ে ও সর্বত্রই মনের গতি; মন তাই ব্যাপক, আবার এককালে তুই বিষয়ে বা তুই স্থানে সংযুক্ত হইতে পারে না, মন তাই অণু। মন শুধু মাত্র অণু পদার্থ হইলে মনের কার্য দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। নিদ্রাকালে স্বপ্নদেখার কাহিনীও আমরা পরে স্মরণ করিয়া অপরকে বলিতে পারিতাম না। মনের যে অংশে অতীত ঘটনাবলী গ্রামোফোন রেকর্ডের মত লিপিবদ্ধ থাকে, সেই অংশের নাম চিত্ত। কোন অতীত ঘটনার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা প্রথমে বলি 'মনে পড়িতেছে না,' পরে মনোরূপ পিন্‌টি চিত্তরূপ রেকর্ডে স্পর্শ করাইলেই অতীতের ঘটনা হুবহু চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন আমরা অতীতের ঘটনা হুবহু বলিতে সক্ষম হই। ইহাতে মন ও চিত্তকে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে মন ও চিত্তকে পৃথক করিয়া বিচার করা যায় না। মন যে স্থানে যায় না সে স্থানের বিষয় আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ভাবিয়া দেখুন অণু মন কী বিরাট কী ব্যাপক। এই মন একদিকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত যেমন যুক্ত, অপর দিকে আত্মার সহিতও সেইরূপ সংযুক্ত। তাই তো আমরা মনের সাহায্যেই সব কিছু অনুভব করি—উপভোগ করি।

প্রাণ এক বিশেষ চৈতন্যশক্তি। প্রাণের ধর্ম গতিশীলতা তথা বাণ বা প্রবাহ। জীব যখন এই বাণ বা প্রবাহকে হারাইয়া ফেলে তখনই জীবের মৃত্যু হয়। জীব জীবিত কি মৃত তাহা এই প্রাণের ধর্ম দেখিয়াই নির্ণিত হয়। হিন্দুধর্মে দর্শন একাধিক।

চার্বাক, কপিল প্রভৃতি মুনিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও প্রাণ ও মন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। যোগ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথঃ মনোনাথস্তু মারুতঃ।"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের রাজা মন, মনের রাজা মরুত বা বায়ু। প্রাণের অস্তিত্ব শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা নিরূপিত হয়, তাই বায়ুই প্রাণ। বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করাই প্রাণ-সংরোধ বা প্রাণায়াম। এই ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে বশে রাখাই যোগের প্রাথমিক কার্য। যিনি বশে রাখেন বা রাখিতে চেষ্টা করেন, তিনিই আমি বা আত্মা। সুতরাং ইন্দ্রিয়, মন বা প্রাণ আমি নহি। আমি সৎ চিৎ আনন্দঘন জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

জীবাত্মা আত্মা ও পরমাত্মা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মাই নিজেকে বহু জীবাত্মা রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রে সেই আমি অর্থাৎ পরমাত্মা ও এই আমি অর্থাৎ জীবাত্মার মধ্যস্থলে আর একটি 'আমি' অর্থাৎ আত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যদিও পরমাত্মাই জীবাত্মা হইয়াছেন, তথাপি পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য অনেক। আত্মাকে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সেতু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জীবাত্মা দেহাশ্রয়ী, দেহোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায়। জননী জঠরে আশ্রয় লইয়া জীবাত্মা ভ্রূণ অবস্থায় জননীর সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইয়া নিজেও সুখ-দুঃখ

উপভোগ করিয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জীবদেহ ও জীবাত্মার এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া জীবাত্মার প্রাণ ও মনেরও ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে। প্রাণ ও মন দেহীর সহজাত ও স্বভাবজাত। কারণ মৃত্যুর পর আত্মার সহিত প্রাণ ও মন বর্তমান থাকে। মন থাকে, তাই মনের সঙ্কল্প বশতঃ আত্মা পুনরায় দেহধারণ করে। প্রাণ থাকে, তাই আত্মার দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সহজাত ও স্বভাবজাত শব্দদ্বয়ের অর্থ এই নয় যে উহারা পূর্বে ছিল না, দেহের সঙ্গেই উহাদের উৎপত্তি হইল। তবে দেহান্তর প্রাপ্তিকে আমরা যেমন জন্ম বলি, প্রাণ ও মনের ক্ষেত্রেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

আমরা বলিয়া থাকি,—'আমার প্রাণ,' 'আমার মন,' 'আমার দেহ' ইত্যাদি। ইহাতেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয় যে প্রাণ ও মন 'আমি' অর্থাৎ আত্মা নহে, দেহও আত্মা নহে। আমার আমিই আত্মা। এই 'আমি' আত্মাই জীব দেহকে আশ্রয় করিয়া আছি, তাই আমিই জীবাত্মা। রথের গতি দেখিয়া যেমন চালক বা সারথির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ দেহের গতিশীলতা ও ক্ষয় বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা জড় জীবদেহে জীবাত্মা, প্রাণ ও মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দেহে জীবাত্মা, প্রাণ ও মন না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু জীবাত্মা ব্যতীত অপর এক আত্মা স্বীকার করা যায় কিরূপে? একটি শাস্ত্র বাক্য দিয়া আলোচনার সূত্রপাত করি। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে,—

> "দ্বাসুপর্ণা সজুয়া সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে।
> তয়োরণং পিপ্পলং স্বদ্বত্ত্য ন শ্নন্যো অতি চাকশীতি॥"

অর্থাৎ সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও আত্মা) এক বৃক্ষ (দেহ) অবলম্বন করিয়া আছেন। তাঁহারা পরস্পর

পরস্পরের সখা। তাহার মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সুস্বাদু ফল ভোগ করেন, অন্যটি (আত্মা) নিরসন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র।

দেহরূপ গুহার মধ্যে দুই জন আছেন। একজন সুখদুঃখের ফলভোগী, আর একজন শুধু দ্রষ্টামাত্র—সাক্ষীমাত্র, দেহাশ্রয়ী হইলেও তিনি ভোক্তা নন। দেহাশ্রয়ী হইয়া যিনি জীবের অর্থাৎ জীবাত্মার শুভাশুভ কৃতকর্মের সাক্ষীমাত্র তিনিই আত্মা নামে অভিহিত। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন ঃ—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।"—১০।২০

অর্থাৎ "হে গুড়াকেশ, (জিতনিদ্র অর্জুন) আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে প্রত্যগাত্মা।" ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাস ও সাক্ষীচেতা। পরমাত্মার সগুণ অভিব্যক্তি। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি দেহে একটি মাত্রই আত্মা থাকিত অর্থাৎ যদি শুধু জীবাত্মাই থাকিত, তাহা হইলে উক্ত বাক্যটি বলিবার প্রয়োজনই থাকিত না। কারণ জীবমাত্রই তো উহা উপলব্ধি করিতেছে। আবার যদি শুধু আত্মাই থাকিত, তাহা হইলে জীব সংজ্ঞার সার্থকতা থাকিত না। কারণ জীবাত্মাই ভোক্তাত্মা। অপর পক্ষে যদি আত্মাকেই ভোক্তা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে আত্মা শুধুমাত্র দ্রষ্টা ও সাক্ষীচেতা বলা ব্যর্থ হইয়া যায়।

শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া এবার অনুভূতির দ্বারা আমরা আত্মাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। আপনারা সকলে স্বপ্ন দেখিয়াছেন নিশ্চয়ই। আমি একটি স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ; এরূপ স্বপ্ন আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকাকালে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন আমি বহু দূর দেশে গিয়াছি, নানাবিধ দৃষ্ট ও অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখিতেছি, বহু ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেছি। এমন সময় দেহের নিকটে একটি বিকট শব্দ হইল, অথবা কেহ গায়ে ধাক্কা

দিয়া ডাকিল। সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, স্বপ্ন দেখারও শেষ হইল। আমার মনে হইল, নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিল, অথবা মনে হইল, আমি যেন সেই স্বপ্নরাজ্য হইতে নিমিষে স্বদেহে ফিরিয়া আসিলাম। এখন গভীর অনুভূতির সহিত পরবর্তী প্রশ্নোত্তরগুলি চিন্তা করুন।

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখাকালে আমার হৃদয়দেশে স্পন্দন চলিতেছিল, অতএব প্রাণ দেহ মধ্যেই ছিল। স্বপ্নাবস্থায় প্রাণ দূর দেশে যায় নাই, যাইতে পারেও না। প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়াকে আমরা মৃত্যু বলি। প্রাণ একবার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। তবে ইহার ব্যতীক্রম যে ঘটে না এরূপ বলিতেছি না, ফিরিয়া না আসাই স্বাভাবিক নিয়ম। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই প্রাণটি কাহার? দেহের অথবা দেহীর তথা জীবাত্মার? আমি দেহ নহি, আমার প্রাণ কথাটি বলায় প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাণটি দেহীর তথা জীবাত্মার। তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় প্রাণ যখন দেহের মধ্যে ছিল, তখন জীবাত্মাও দেহের মধ্যেই ছিল। জীবাত্মা দেহাশ্রয়ী ও প্রাণাশ্রয়ী। তাহা হইলে প্রশ্ন আসে, তবে স্বপ্নাবস্থায় কে বাহিরে গিয়াছিল? সুতরাং জীবাত্মা ব্যতীত দেহে আর একটি চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়—যিনি স্বপ্নাবস্থায় দূরদেশে গিয়াছিলেন।

যদি ধরা হয় জীবাত্মাই দূরদেশে গিয়াছিল, তাহা হইলে প্রশ্ন আসে যে, যদি জীবাত্মাই দূরদেশে রহিল, তবে যখন দেহের নিকটে বিকট শব্দ হইল অথবা কেহ গায়ে ধাক্কা দিয়া ডাকিল তখন কে জাগিয়া উঠিল? উত্তরে তো বলিতেই হইবে যে নিদ্রিত জীবাত্মাই জাগিয়া উঠিল; জীবাত্মা দূরদেশে যায় নাই। সুতরাং জীবাত্মা ব্যতীত দেহে আর একটি আত্মাকে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

কিছুদিন পূর্বে কাগজে একটি স্বপ্নের কাহিনী পড়িয়াছিলাম। এক মহিলার একটি কন্যা হারাইয়া গিয়াছিল, বহু অনুসন্ধান করিয়াও কন্যাটিকে পাওয়া গেল না। রাত্রে ঐ মহিলা স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার কন্যা নিকটবর্তী পুকুরে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। পর দিবস প্রভাতে কন্যাটিকে ঐ পুকুরেই মৃত অবস্থায় ভাসিতে দেখা গেল। চিন্তা করুন তো ঐ স্বপ্নটি কে দেখিয়াছিল, মহিলাটির আত্মা না জীবাত্মা? জীবাত্মা সারাদিন কন্যার অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিল। ব্যাপক আত্মাই—দ্রষ্টা ও সাক্ষীচেতা আত্মাই উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয় সমূহের বিশ্রাম গ্রহণ কালে চিত্তের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইলে ব্যাপক আত্মার সহিত প্রাণ ও মন সহ জীবাত্মার ভাব-সংযোগে অর্থাৎ আত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ঐক্য সাধিত হইলে সাক্ষীচেতা আত্মার দৃষ্ট ঘটনাটি জীবাত্মায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। একাগ্রচিত্ত যোগী জাগ্রতাবস্থাতেই জীবাত্মা ও আত্মার মধ্যে মিলন ঘটাইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং দূর ও নিকটের অনেক তথ্যই জানিতে পারেন।

আত্মা সম্পর্কে আর একটি কথা বলি। আমার প্রাণ, আমার মন। প্রাণ ও মনটি আমার অর্থাৎ দেহীর—জীবাত্মার। আপনাদের জন্য এই কাহিনী লিখিতেছি, হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলাম, বিষয়ান্তরে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইল; হয়তো বা কার্যান্তরেও যাইতে হইল। পরে অবসর সময়ে পুনরায় এই লেখার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া পূর্বসূত্র ধরিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম, লেখাও সম্ভব হইল। এখন ঐ স্বপ্নের কথা চিন্তা করুন। মনোরম স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পুনরায় শুইয়া পড়িলাম, ঐ মনোরম স্বপ্নের শেষটুকু দেখিবার জন্য আকুল বাসনা লইয়া ঘুমাইয়াও পড়িলাম। কৈ মধ্যপথে ভাঙ্গিয়া যাওয়া স্বপ্নের শেষটুকু তো আর দেখা গেল না। আপনারা ভাঙ্গা স্বপ্নের শেষাংশ পুনরায়

দেখিয়াছেন কি? যদি জীবাত্মা স্বপ্ন দেখিত বা স্বপ্নকালে দূরদেশে যাইত তাহা হইলে ঐ স্বপ্নের শেষটুকুও দেখা যাইত বা দেখা সম্ভব হইত; যেমন অর্দ্ধলিখিত কাহিনী একবার পরিত্যক্ত হইয়া পুনরায় লেখা সম্ভব হইল। তাহা যখন সম্ভব হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বপ্ন দেখে নাই। যিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তিনি আত্মা স্বয়ং। সুতরাং দেহে জীবাত্মা ব্যতীত অপর এক ব্যাপক আত্মার অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার্য। এই আত্মা ব্যাপক। দেহ ও দেহের বাহিরে সর্বত্রই ইনি প্রকাশিত।

এখন পরমাত্মা বিষয়ক দুই-একটি কথা বলি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা কালে সগুণ-নির্গুণের অতীত গুণাতীত ব্রহ্মের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ। বিশ্বের সমষ্টিগত যে আত্মা তাহাই পরমাত্মা। জীবাত্মা, প্রাণ ও মন আত্মায় মিলিত হয়। কিন্তু পরমাত্মায় একমাত্র আত্মাই মিলিত হয়। জীবাত্মার জীব সংজ্ঞা অর্থাৎ সংস্কার, প্রাণ ও মন পরমাত্মায় মিলিত হইতে পারে না। কারণ পরমাত্মায় প্রাণ ও মন নাই। পরমাত্মা 'অপ্রাণা হি অমনাঃ'। সুতরাং প্রাণ-মন লইয়া কোন আত্মাই পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে না। প্রাণ মন লইয়া ঈশ্বর দর্শন—তথা দেব দর্শন হইলেও হইতে পারে, কারণ, ঈশ্বর সগুণ, যিনি সগুণ নির্গুণের অতীত তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে নিজেকেও সেই সগুণ নির্গুণের অতীত অবস্থায় উন্নীত করিতে হয়। একমাত্র সমাধিযোগেই তাহা সম্ভব।

সমাধি অবস্থায় যোগীর প্রাণ থাকে রুদ্ধ। প্রাণের কোন কার্য থাকে না, শ্বাস প্রশ্বাসও প্রবাহিত হয় না। যোগীর দেহ জড়বৎ নিশ্চল-নিঃস্পন্দ। ঐ রুদ্ধ প্রাণ থাকা না থাকা সমান। এই অবস্থায় মনের যে দশা হয় তাহা মনের নিরুত্থান অবস্থা,

যাহাকে বলা হয় অমনস্ক অবস্থা। এইরূপ অবস্থায় চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকে না,—চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। সুতরাং মন থাকা না থাকাও সমান। যোগীর প্রাণ ও মনের এইরূপ অবস্থা হইলে জীবাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মায় কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। সেইজন্য কেবল এই সমাধি অবস্থাতেই আত্মায় পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। আত্মা অপার ও অব্যক্ত আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে। এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, এই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। পরমাত্মার দর্শন লাভ সম্ভব নয়। কারণ পরমাত্মা অরূপ—অব্যয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলন সম্ভোগে মানুষ যে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা কি কেহ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন? পারেন না। সমাধিলব্ধ ব্রহ্মানন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহা শুধু অনুভবের বস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানও ভাষায় সম্যগ প্রকাশ করা যায় না। সমাধিবান যোগী যাহা বলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা হইতেছে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।' 'অহমাত্মা ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সোঽহং 'শিবোঽহং' ইত্যাদি। এইরূপ বাক্যগুলিই ব্রহ্মজ্ঞানের বাহ্যিক অভিব্যক্তি।

জীবাত্মা আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক এতাবৎ আলোচনায় এক অভেদ তত্ত্বই সূচিত হইতেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্যস্বরূপ এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা বা চৈতন্যের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যোগীরাট্ গোরক্ষনাথ বলেন—

"আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।
ত্রয়ানামেক সংভূতিরাদেশ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ জীবাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা—এই তিনের বিচার করিয়া যিনি এই তিনকে এক বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। 'আদেশ' শব্দটি উপনিষদের রাহস্যিক 'আদীশঃ' শব্দের রূপান্তর।

হিন্দুর দর্শন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ; ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন এবং জীবাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ঐ সকল বিষয়ে হিন্দুধর্মের অপর মতাবলম্বিগণ কিরূপ মত পোষণ করেন তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি।

বৌদ্ধমতে আত্মা ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতক কাহিনীগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধমতে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ হইতেছে যে, জীবকে একদিন নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। বৌদ্ধমতে এই নির্বাণ শব্দের অর্থ হইতেছে নিবিয়া যাওয়া। দীপ নিবিয়া গেল, দীপশিখার এখানেই শেষ।

মাধ্যমিক বৌদ্ধমতে শূন্যই আত্মা, অহং বুদ্ধি আকস্মিক ও নিরাশ্রয়। এই অহং জ্ঞানের কোন অবলম্বন নাই। বৌদ্ধমতের এই শূন্যের কোন সত্তা নাই, উহা সর্বহীন অবস্থা বা void মাত্র। সুতরাং বৌদ্ধমত হইতেছে—অসংবাদ—নিরীশ্বরবাদী ধর্মমত।

বৌদ্ধমতের 'নিবাণ' ও 'শূন্য' শব্দ দুইটি যোগশাস্ত্রেও দৃষ্ট হওয়ায় এস্থলে উহাদের বিষয় সামান্য আলোচনা আবশ্যক। যোগমতের নির্বাণ মুক্তি হইতেছে জীবাত্মার পরমাত্মায় লয়প্রাপ্তি। অর্থাৎ দীপশিখা নিবিয়া গেলে দীপশিখার সেই জ্যোতি, জ্যোতির আধারস্বরূপ পরমজ্যোতিতে বিলীন হইয়া যাওয়া। যোগমতের এই নির্বাণ মুক্তির কথায় পরে আসিতেছি। যোগমতে শূন্যের সত্তা বর্তমান।

"শূন্যাৎ সত্তামাত্রমুৎপন্নম্।" এই শূন্যের পঞ্চ গুণও আছে। যথা—লীনতা পূর্ণতা উন্মনী লোলতা মুর্চ্ছতা ইতি পঞ্চগুণং শূন্যম্।"

যোগমতে শূন্যের সত্তা ও উহার পঞ্চ গুণ থাকায় শূন্য অর্থে সর্বময় পূর্ণ। সর্বহীন অবস্থা নয়। সুতরাং ইহা সংবাদ। শূন্যের সত্তা হইতেই বোধ জ্ঞানের উন্মেষ। শূন্যের সহিত শূন্যের সমন্বয়ে শূন্য, শূন্যের অন্তরে শূন্য, শূন্যের পুরণে শূন্য এবং শূন্যের হরণেও শূন্য। এই শূন্যকেই পূর্ণ আখ্যা দিয়া উপনিষদে বলা হইয়াছে,—

"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

তাই ব্রহ্ম নিয়ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াও অক্ষয় ও অব্যয়। জগৎ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইলেও তিনি অক্ষয় ও অব্যয়। তিনিই পূর্ণ,—তিনিই মহাশূন্য। বহু উপনিষদেই কোন না কোন প্রকারে শূন্য সাধনার নির্দেশ পাওয়া যায়।

চার্ব্বাক মুনিও নাস্তিকবাদী। তিনিও বুদ্ধের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন। চার্ব্বাক মতে দেহ হইতে অতিরিক্ত পৃথক কোন চৈতন্য নাই। জীবদেহই আত্মা। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তাহা দেহের উপাদানে সৃষ্ট। চার্ব্বক মুনি বলেন,—

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"

অর্থাৎ গুড় ও তণ্ডুলাদি দ্রব্য সকল প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিলে মাদকতার সৃষ্টি হয়। অনুরূপ অচেতন ভূত সমূহের সমষ্টির পরিমাণে গঠিত জীবদেহে চৈতন্যের উৎপত্তি। দেহাতিরিক্ত কোন পৃথক চৈতন্য বা আত্মা নাই। চার্ব্বাক মতের অন্যতম সম্প্রদায় বলেন,—মনই আত্মা, মন ভিন্ন পৃথক আত্মা নাই। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য ও মন ভিন্ন পৃথক আত্মা স্বীকৃত না হওয়ায় চার্ব্বাক মতে যেমন ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই, সেইরূপ চার্ব্বাক মতে জন্মান্তরবাদও স্বীকৃত হয় নাই।

সাঙ্খ্যদর্শনের প্রবক্তা মহর্ষী কপিল চার্ব্বাক মুনির ঐ মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—গুড় ও তণ্ডুলাদি দ্রব্য সমূহের মধ্যে মদশক্তি সূক্ষ্মভাবে বর্তমান আছে। গুড় ও তণ্ডুলাদি দ্রব্য সকলের পরস্পর সংযোগে সুক্ষ্মভাবে অবস্থিত ঐ মদশক্তির স্ফূরণ মাত্র। তবে কপিলও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের একান্ত অভাব। সাঙ্খ্যদর্শনে বলা হইয়াছে—"ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ" তবে সাঙ্খ্যমতাবলম্বিগণ পুরুষ ও প্রকৃতি স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যের পুরুষ উদাসীন—অকর্তা—খঞ্জ, কিন্তু জ্ঞানময়। প্রকৃতি জড়া—অন্ধা, কিন্তু পুরুষ সংস্পর্শে আসিয়া ত্রিগুণা ক্রিয়াশীলা। ইঁহারা এককভাবে কিছুই করিতে পারেন না। প্রকৃতি পুরুষে অনুক্রান্তা হইয়া জাগতিক কার্য্যসকল সম্পাদন করেন। প্রকৃতিই প্রধান। এই দর্শনতত্ত্বের দেবরূপই কালীমূর্ত্তি। শাঙ্খ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় নির্গুণ হওয়ায় এই তত্ত্বের পুরুষ তথা শিব শবাকারে শায়িত। প্রকৃতি পুরুষের বক্ষস্থলাশ্রয়া হইলে ত্রিগুণা ও ক্রিয়াশীলা হন এবং জাগতিক কার্য্যসকল সম্পাদন করেন। প্রকৃতির কার্য্য পুরুষে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হওয়ায় পুরুষ অকর্তা হইয়াও কর্মফল ভোক্তা। অবিবেক বশতঃ প্রকৃতি পুরুষের মিলনই জাগতিক দুঃখের কারণ।

"প্রকৃতি পুরুষ সংযোগেন চাবিবেকো হেয় হেতু॥"

বিবেকদ্বারা প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সাঙ্খ্যদর্শনে ইহাই জীবের মুক্তি। "বিবেক খ্যাতিস্তু হানোপায়।" হান অর্থে মুক্তি।

বেদান্তের শঙ্কর ভাস্যে কপিলের ঐ মতকে খণ্ডন করিতে বলা হইয়াছে,—কথঞ্চোদাসীনোপুরুষ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ।" অর্থাৎ উদাসীন পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিকে প্রবর্তনা করিতে পারে?

বেদান্ত দর্শন 'মতে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাত্মার বা জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ। বেদান্তের মায়া অনির্বচনীয়া, এই মায়ার কোন পৃথক সত্তা নাই; মায়া ব্রহ্মেই কল্পিতা। জ্ঞানের দ্বারা এই মায়াকে নাশ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি।

নাথযোগ-দর্শনে পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি। যোগীবর গোরক্ষনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে বলা হইয়াছে,—

"তস্যেচ্ছা মাত্রেণ ধর্মাধর্মিণী নিজ শক্তি প্রসিদ্ধা" ১।৫

এই প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে কিছুতেই সাঙ্খ্যদর্শনের ন্যায় পৃথক করা যায় না বা এই প্রকৃতিকে বেদান্তদর্শনের ন্যায় বিনাশ করাও যায় না। আবার নাথদর্শনে পুরুষ যেমন চিন্ময়, প্রকৃতিও সেইরূপ চিন্ময়ী। প্রকৃতি ও পুরুষ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই দর্শনের টীকায় বলা হইয়াছে,—

"সাঽপি শক্তি চিদ্রূপা শিবেন সহ নিত্য সংশ্লিষ্টা, ন তু সাংখ্য মতবৎ জড়া বা বৈদান্তিক মতবৎ অনির্বচনীয়া—বিনাশশীলা।" হরগৌরী মূর্তি ও অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি এই দর্শনতত্ত্বের দেবরূপ। প্রকৃতির প্রসরভাবই সৃষ্টি, প্রকৃতির সঙ্কোচ ভাবই প্রলয়। বস্তুতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন। মহাসিদ্ধ যোগীরাট্ গোরক্ষনাথ বলেন,—

কটুত্বং চৈব শীতত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে।
প্রকৃতিঃ পুরুষ স্তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে॥
—গোঃ সং ৫।১১৫

যে প্রকার কটুত্ব, শৈত্য ও মৃদুত্ব জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আত্মা ও প্রকৃতি আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

মিমাংসকগণের মতে—আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত বটে, কিন্তু আত্মা দেহাশ্রয়ী ও জরা মরণশীল। ইনিই কর্মসমূহের কর্তা ও কর্মফল ভোক্তা।

ন্যায় মতাবলম্বিগণ বলেন,—দেহাশ্রয়ী বহু সংসারী আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ছাড়াও অন্য এক স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিরাজমান।

ঈশ্বরকে পাওয়া ও ঈশ্বর হওয়া

যোগসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া ঈশ্বরে লীন হইয়া যাওয়া বা মুক্তিলাভ করা। সংসার সাগরে আসা যাওয়ার আবর্তে বারবার হাবুডুবু না খাইয়া শান্তিময়ের শান্ত ক্রোড়ে সকল বিশ্রান্তির অবসান ঘটাইয়া চিরশান্তি লাভ করা। এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে ঈশ্বরকে লাভ করা অথবা ঈশ্বরত্ব লাভ করা কোন্‌টি প্রেয়, কোন্‌টি কাম্য, কোন্‌টিই বা শ্রেয়। ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পাওয়া তো পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া নয়। ঈশ্বর বিরাট—মহৎ, সেই বিরাটকে—সেই মহৎকে হৃদয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া রাখা ঈশ্বরকে আংশিক পাওয়া মাত্র,—পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া নয়। কিন্তু সাধনার দ্বারা আমি ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পরি, ঈশ্বর হইতে পারি। আমি কাষ্ঠ খণ্ডই হই অথবা বিরাট বনভূমিই হই, আমি অগ্নিকে পরিপূর্ণ ভাবে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি না; কিন্তু আমি নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে অগ্নিতে পরিণত করিতে পারি, অগ্নি হইয়া যাইতে পারি। আমি ক্ষুদ্র কূপই হই আর বিরাট সরোবরই হই, সাগরকে পরিপূর্ণ ভাবে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি না বা পরিপূর্ণ ভাবে পাইতে পারি না। যাহা পাই বা যাহা পাইতে পারি তাহা আংশিক পাওয়া মাত্র; কিন্তু আমি সাগরে মিশিয়া গিয়া সাগর হইতে পারি। সুতরাং ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে পাওয়া আংশিক পাওয়া মাত্র; পরন্তু ব্রহ্ম হওয়া সে তো

পরিপূর্ণ ভাবেই হওয়া। পরম সত্তায় আপন সত্তাকে একেবারে বিলীন করিয়া দেওয়া। ইহাই তো সাধনার লক্ষ্য—ইহাই তো প্রকৃত শান্তি—ইহাই তো পরামুক্তি। কিন্তু কর্মের ক্ষয় না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—"নাস্ত্যকৃত কৃতেন" অর্থাৎ কর্মের দ্বারা সেই অকৃত বস্তুকে লাভ করা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। কারণ, কর্ম বন্ধনের হেতু; সে বন্ধন স্বর্ণেরই হউক, অথবা লৌহেরই হউক। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

সদসৎ কর্মের ফল জীবকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কর্মের ক্ষয় না হইলে জীবের মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম না করিয়া তো জীব ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। তবে এই কর্মক্ষয়ের উপায় কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ হইতেছে যে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করে। কর্মে নিষ্ঠা ও কর্মফলে অনাশক্তিই নিষ্কাম কর্মের সাধনা। ইহার দুইটি পথ। একটি হইতেছে ঈশ্বরে অচলা ভক্তি ও শরণাগতি, যাহা দ্বৈতবাদিগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন। আর একটি হইতেছে জ্ঞান। যোগসাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান ও পরে দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত সমতত্ত্ব জ্ঞান অর্জিত হইলে সাধক মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

মুক্তি

এখন মুক্তি কি তাহাই আলোচনা করি। পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হইয়াছে,—

> "পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
> স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" কৈবল্য পাদ—৩৪

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী যখন পুরুষার্থ ত্যাগিনী হন, অর্থাৎ প্রকৃতি যখন আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে আত্মবিকৃতি দেখাইতে পারেন না তখন পুরুষ কেবল ও নির্গুণ হন। আত্মা যখন স্বরূপে ও চৈতন্য মাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তখন আত্মার কোনরূপ বিকার দর্শন হয় না। আত্মার ঐরূপ নির্বিকার বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা মোক্ষ বলে।

যে সকল মতবাদ জীবের মোক্ষলাভে বিশ্বাসী তাঁহাদের সেই মুক্তিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। জন্মেজয়ত্ব বা বিদেহ মুক্তি এবং মৃত্যুঞ্জয়ত্ব বা জীবন্মুক্তি।

জন্মেজয়ত্ব বা বিদেহ মুক্তি হইতেছে পুনর্জন্মরোধ, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর জন্ম না হওয়া। এই বিদেহ মুক্তির কয়েকটি স্তর আছে। হেমাদ্রৌ ধর্মশাস্ত্র মতে বিদেহ মুক্তি পঞ্চস্তরের। সনৎকুমার তৎপিতা ব্রহ্মাকে মুক্তির প্রকার ভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে পিতামহ ব্রহ্মা বলেন,—

> "মুক্তিস্তু শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্বিধং।
> সালোক্যং লোক প্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপ্যং তৎ সমীপতা॥
> সাযুজ্যং তৎ স্বরূপস্থং সার্ষ্টিস্তু ব্রহ্মণো লয়ং।
> ইতি চতুর্বিধা মুক্তি নির্বাণঞ্চ তদুত্তরম্॥"

মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য মুক্তি, ব্রহ্মের নিকট সদা অবস্থান করাই সামীপ্য মুক্তি, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতির নাম সাযুজ্য মুক্তি, এবং ব্রহ্মের মূর্তিভেদের লয়ের নাম সার্ষ্টি মুক্তি। এই চারি প্রকার মুক্তির পর যে মুক্তি তাহাই হইতেছে নির্বাণ মুক্তি। এই নির্বাণ মুক্তি লাভই জন্মেজয়ত্ব বা বিদেহ মুক্তি লাভ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে মুক্তির প্রথম চারিটি স্তর হইতে জীবের পুনরাগমন হয়। এ স্থলে লক্ষ্যণীয় যে সার্ষ্টি মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়রূপ মুক্তি হইলেও জীবের পুনরাগমন সম্ভব। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে গুণের অভাব নয়, গুণ অন্তর্লীন মাত্র। মুক্তির এই স্তরে জীবের বাণ বা প্রবাহ বিলুপ্ত নয়, উহা স্তব্ধ বা স্তম্ভিত মাত্র। সুতরাং যে কোন সময় তাহা আবার ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু মুক্তির পঞ্চম স্তরে পৌছিলে অর্থাৎ নির্বাণ মুক্তিতে আর পুনরাগমন হয় না।

শিবগীতাতে মহেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে মুক্তির প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

'সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্টিং সাযুজ্যমেব চ।
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা॥

এই কৈবল্য মুক্তি ও নির্বাণ মুক্তি অভিন্ন। নির্বাণ শব্দেব ব্যাখ্যা হইতেছে, "নির্গতিং বাণং গমনং প্রবাহং বা যস্মিনিতি।" যাহা হইতে বাণ, প্রবাহ বা গতিশীলতা নির্গত হইয়া গিয়াছে তাহাই নির্বাণ। মন ও প্রাণ আত্মার চিরসাথী। মনের ধর্ম সঙ্কল্প বা ইচ্ছা, এবং প্রাণের ধর্ম গতিশীলতা। তাহা হইলে প্রাণই বাণ বা প্রবাহ। 'সার্ষ্টিস্তু ব্রহ্মণো লয়ং' অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়রূপ সার্ষ্টি মুক্তি হইলেও মুক্তির এই চতুর্থ স্তরে আত্মার সহিত প্রাণ ও মন বর্তমান থাকে। তবে মনের সঙ্কল্প বা

ইচ্ছাধর্ম সে অবস্থায় সুপ্ত, এবং প্রাণের বাণ বা প্রবাহ সে অবস্থায় স্তব্ধ। যদি বলা যায় যে প্রাণ ও মন মুক্তির এই স্তরে আত্মার সহিত বর্তমান থাকে না, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মুক্তির এই চতুর্থ স্তর হইতে যখন পুনরাগমন সম্ভব, তখন পুনর্জন্মে দেহে প্রাণ ও মন কোথা হইতে আসিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে মুক্তির চতুর্থ স্তর হইতে যখন পুনর্জন্ম হওয়া সম্ভব, তখন এই স্তরে আত্মার সহিত প্রাণ ও মন বর্তমান থাকে। কিন্তু মুক্তির পঞ্চম স্তরে প্রাণ ও মন আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন কেবল আত্মাই থাকেন অর্থাৎ আত্মা কেবল হইয়া যান। আত্মার এই অবস্থা লাভই কৈবল্য মুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি।

ইন্দ্রিয় সমূহ দেহাশ্রয়ী হওয়ায় দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সমূহেরও নাশ হইয়া থাকে। মন অতীন্দ্রিয় হওয়ায় প্রাণাশ্রয়ী। সুতরাং নির্বাণ মুক্তিতে প্রাণ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইলে মনও প্রাণের সহিত আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেবল আত্মা বা প্রাণহীন তথা নির্বাণ আত্মায় মনের অবস্থিতি স্বীকার করা যায় না! কেবল আত্মা বা নির্বাণ আত্মা নিঃসঙ্গ। 'অপ্রাণাঃ হি অমনাঃ।'

এখন মৃত্যুঞ্জয়ত্ব বা জীবন্মুক্তিবাদের কথা বলি। জীবন্মুক্তি হইতেছে জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ। নিরালম্বোপনিষদে বলা হইয়াছে,—

"নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদনিত্য সংসার
সমস্ত সংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।"

সংকল্প ও বিকল্প মনের ধর্ম, মন সদাই চঞ্চল। সাধনার দ্বারা মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিতে পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই মনকে মৃত বলিয়া থাকেন। সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া মনের বৈরাগ্য অবস্থাই মুক্তি। বড়ই কঠিন কাজ, অতীন্দ্রিয় মন ইন্দ্রিয় সমূহের রাজা হইলেও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া পড়ে। সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করিতে পারিলে চিত্তের নিরুত্থান অবস্থা প্রাপ্তি হয়, চিত্তের এই নিরুত্থান অবস্থা প্রাপ্তিই 'মনোন্মনী' বা 'অমনস্ক' অবস্থা। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা। যিনি জীবদ্দশাতে এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে না পারেন তাঁহার নির্বাণ মুক্তি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সাংখ্য যোগের উপসংহারে বলিতেছেন,—

"এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং বিমূচ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণ মৃচ্ছতি॥"

ব্রাহ্মীস্থিতিলব্ধ জীবন্মুক্ত যোগিগণ অন্তকালে নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন। জীবন্মুক্তিবাদের এই মতে প্রথমে জীবন্মুক্তাবস্থা ও দেহান্তে নির্বাণ মুক্তি স্বীকৃত।

বিশুদ্ধ জীবন্মুক্তিবাদী যোগিগণ সাধনার দ্বারা স্বীয় মানব তনুকে সিদ্ধতনুতে, ক্রমে সিদ্ধ তনুকে দিব্য তনুতে এবং সেই দিব্য তনুকে ক্রমসাধনায় প্রণব তনুতে উন্নিত করিয়া পরমপদে সদা যুক্ত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করেন। এই স্তরের যোগী-ব্যক্তি মনকে যেমন নিজ বশে রাখেন, তেমনই প্রাণও থাকে যোগীর নিয়ন্ত্রাধীনে। প্রাণের ধর্ম গতিশীলতা বা স্পন্দন। প্রাণের সেই গতিশীলতা—তথা প্রাণের বাণ বা প্রবাহকে এই স্তরের যোগী

ইচ্ছামত রুদ্ধ বা সক্রিয় করিতে সক্ষম হন। জীবন্মুক্তিবাদের এই স্তরের যোগী-ব্যক্তি আপন ইচ্ছামত সূক্ষ্ম বা স্থূল যে কোন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন। জীর্ণ কলেবর ত্যাগ অথবা নব কলেবর ধারণ—তথা মৃত্যু বা জন্মান্তর গ্রহণ জীবন্মুক্ত যোগীর ইচ্ছাধীনে হইয়া থাকে। এই অবস্থালব্ধ যোগী সদা ব্রহ্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বলিতে সক্ষম হন 'সোঽহং'—'অহং ব্রহ্মাস্মি' যে হেতু "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হন, ব্রহ্মের স্বরূপই বা বলি কেন, জীবনযজ্ঞের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া যোগী-ব্যক্তি নিজেই ঈশ্বর হইয়া যান,—

"স যাত্যাত্মানমৈশ্বরম্"।

ইতি—যোগ সোপানং সমাপ্তম্

পৃথ্যাপ্তেজোঽনিল খে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যু
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥

—শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ

পরিশিষ্ট

সিদ্ধ যোগী পুরুষদের অপরোক্ষ জ্ঞান

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্ব প্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্ব প্রকাশো যতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপকঃ॥ —শিববাক্য

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়া পরঃ।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদাখলু॥ —শিববাক্য

যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে —তন্ত্রবচন

ন শূন্যরূপং ন বিশূন্যরূপং
ন শুদ্ধরূপং ন বিশুদ্ধরূপং।
রূপং বিরূপং ন ভবামি কিঞ্চিৎ
স্বরূপ রূপং পরমার্থ তত্ত্বং॥ —গোরক্ষনাথ

অহং শিবশ্চেৎ পরমার্থ তত্ত্বং
সমস্তরূপং গগনোপমঞ্চ॥ —গোরক্ষনাথ

নির্মল নিশ্চল গগনাকারং
স্বয়মিহ তত্ত্বং সহজাকারং। —গোরক্ষনাথ

অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্তঃ স্বভাববান॥ —যোগীগুরু ঘেরণ্ড

তাবদাকাশ সঙ্কল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্ততে
নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে —যোগীন্দ্র স্বাত্মারাম

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ॥
তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ —যোগীপতঞ্জলি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
ট	১৪	প্রাপ্ত	প্রাপ্তি
ঢ	৯	স্বত	স্বতন্ত্র
৪	৫	মৃতুঞ্জয়	মৃত্যুঞ্জয়
৫	২	গৃহিত	গৃহীত
৮	১০	হয়	হ'ন
৮	১১	পায়	পান
১১	৭	সম্যগ্	সম্যক্
২২	২০	আলাপণকালে	আলাপনকালে
৫০	৮	তে	মতে
৫৬	২৪	জ্বরা	জরা
৫৮	২২	জলন্বর	জলন্ধর
৭৪	৮	ধারাণ	ধারণা
৭৫	৫	সত্বার	সত্তার
৭৮	১	অবধুত	অবধূত
৭৮	৪	জীবাত্মা পরমাত্মনোঃ	জীবাত্মপরমাত্মনোঃ
৮৬	২৫	মনিপুর চক্র	মণিপুরচক্র
৯১	১৪	ধুপ	ধূপ
৯৫	১০	বিন্দুর্বিধুময়োজ্ঞেয়ো	বিন্দুর্বিধুময়োর্জ্ঞেয়ো
৯৫	২৩	ক্ষারত	ক্ষরিত
৯৬	১২	কণ্ঠাকূপে	কণ্ঠকূপে
৯৭	৬	ঘেরগু	ঘেরণ্ড
১১৫	২৬	রূশান্তর	রূপান্তর
১১৭	১৭	কিণ্‌দিভ্যঃ	কিণ্বাদিভ্যঃ
১১৮	১৩	শাঙ্খ্যের	সাঙ্খ্যের
১১৮	২১	আত্যন্তিক	আত্যন্তিক